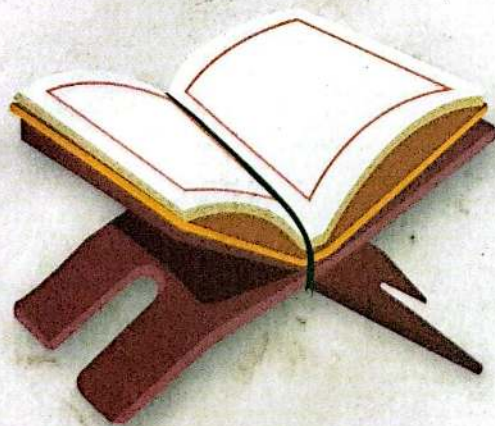


# କୃତ୍ତାନ୍ତ ଜୀବନର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ

ଡ. ଇସ୍ଲାଦ କୁନାହିସୀ



ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ

કુવઝાત  
ડીવતેવ  
ગાઈડલાઈત

# কুরআন: জীবনের গাইডলাইন

মূল

ড. ইয়াদ কুনাইবী

অনুবাদ

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল জলিল

সম্পাদনা

আশিক আরমান নিলয়

**মন্দীপন**

প্রকাশন লিমিটেড





প্রকাশক : সন্দিপন প্রকাশন লিমিটেড  
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা  
☎ ০১৪০৬ ৩০০ ১০০, ০১৭১১ ০৬৯ ০৩৯, ০২-৪৭১১১৯৪০  
sondiponprokashon@gmail.com  
www.facebook.com/sondiponprokashon  
www.sondipon.com

### কুরআন: জীবনের গাইডলাইন

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০২১

ISBN: 978-984-95895-4-9

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২১

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর ২০২২

বানান : আসাদুল্লাহ আল গালিব

মুদ্রণ ও বাঁধাই : বই কারিগর

অনলাইন পরিবেশক : ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম

মূল্য : ১৬৭৳

USD : 5



# সূচিপত্র

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| অনুবাদকের দুই-কলম .....            | ৭  |
| কুরআন বোঝার নিয়ামাত .....         | ৯  |
| অন্তরের খোঁজ নিন .....             | ১২ |
| চিঠি এসেছে... ..                   | ১৫ |
| আল্লাহর রশি .....                  | ১৮ |
| মর্যাদার সোপান .....               | ২০ |
| অশ্রুসজল চোখ .....                 | ২৩ |
| পরিস্থিতি যখন প্রতিকূল .....       | ২৬ |
| সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য ..... | ২৯ |
| এক ক্লিকেই...! .....               | ৩২ |
| নাক কাটলে কাটুক .....              | ৩৫ |
| দারুণ অফার .....                   | ৩৭ |
| বোনের তরে নিবেদন .....             | ৪০ |
| মজবুত শেকড় .....                  | ৪৩ |
| উত্তম বিকল্প .....                 | ৪৫ |
| বৃদ্ধ মুজাহিদ .....                | ৪৭ |
| নিশ্চিত গন্তব্যে যাত্রা .....      | ৪৯ |
| লেগে থেকো না, শুধরে যাও .....      | ৫১ |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| এত ভাবা-ভাবির দরকার নাই! .....           | ৫৪ |
| প্রেমহীন আমল, প্রাণহীন দেহ .....         | ৫৭ |
| কুরআনের ব্যাপারে ভুল উপলব্ধি .....       | ৬০ |
| রাসূলের নিরাশা .....                     | ৬৩ |
| দুই উদ্ধৃতি .....                        | ৬৫ |
| আমরা কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইবাদাত করি? ..... | ৬৮ |
| মুখ দিয়েছেন যিনি... ..                  | ৭১ |
| অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা .....              | ৭৪ |
| এটাও হত্যা .....                         | ৭৭ |
| ইয়াতীমের সম্পদ .....                    | ৮০ |
| মদ নয়, ড্রিংকস; সুদ নয়, মুনাফা .....   | ৮৩ |
| সীসাঢালা প্রাচীর .....                   | ৮৬ |
| লাঞ্ছনার চার-হেতু .....                  | ৮৮ |
| আড়ালে তার সূর্য হাসে .....              | ৯২ |
| কত বেশি লাইক .....                       | ৯৫ |
| হিফয বনাম ইলম .....                      | ৯৭ |

## অনুবাদকের দুই-কলম

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ  
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

উন্মাতে মুসলিমার ভাগ্যাকাশের তিমির রজনীতে দ্বীনের যে-সকল মহাপ্রাণ নাবিক নববি-আলোর মশালকে এখনো প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রেখে যাওয়া ওহির আমানত-ওয়াফাদারীর সাথে রক্ষা করছেন, কুরআন-সুন্নাহর চিরন্তন সত্যবাণী নিয়ে উন্মাহর বিবেকের দরোজায় কড়া নাড়ছেন বারবার; তাদেরই একজন—আরব বিশ্বের জনপ্রিয় ইসলামি ব্যক্তিত্ব, দায়ী-ইলাল্লাহ—ড. ইয়াদ কুনাইবী হাফিয়াহুল্লাহ।

তার সাড়া জাগানো অনলাইন সিরিজগুলোর একটি ‘বিল কুরআনি নাহুইয়া’। মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ‘তাদাব্বুরে কুরআন’ হলেও এখানে রয়েছে মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধির বহুবিধ উপকরণ। সাহাবা আজমাঈন রাদিয়াল্লাহু-প্রেমের অমৃত-সুধা পান করে তাঁর শর্তহীন আনুগত্য ও কুরআনময় জীবন গঠনের যে উপমা পেশ করেছেন, তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে সিরিজের একটা বড় অংশ জুড়ে। পাশাপাশি মানবজীবনের বহুমুখী জাগতিক ও আত্মিক সমস্যার সমাধান রয়েছে পুরো সিরিজের বাঁকে বাঁকে।

ড. ইয়াদ কুনাইবীর আলোচনার একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি আলোচনার শুরুতে বাস্তব জীবন থেকে উদাহরণ নিয়ে আসেন; তারপর সেই সূত্র ধরেই মূল আলোচনায় প্রবেশ করেন। ফলে পাঠক-হৃদয় সহজেই আলোচ্য বিষয়টি আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়। শাইখের লেকচারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি যে-কোনো বিষয়ে শাখাগত আলাপ এড়িয়ে মৌলিক বিষয়ের প্রতি শ্রোতার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

উদাহরণস্বরূপ, তিনি সালাতে স্থিরতা, পর্দার প্রতি যত্নবান হওয়া, কুরআন তিলাওয়াতে মনোযোগ দেয়া প্রভৃতির গুরুত্ব বোঝাতে চান। প্রথমেই তিনি আল্লাহ তাআলার সাথে ভালোবাসার বিষয়টিকে সামনে আনেন, শ্রোতার কাছে আল্লাহ ও



বান্দার মধ্যকার সম্পর্কের দিকটি জোরালোভাবে উপস্থাপন করেন; যাতে করে বান্দার হৃদয়ে আল্লাহর ভালোবাসা তৈরি হয় এবং ওই আমলগুলো এমনিতেই ঠিক হয়ে যায়।

এ ছাড়াও শাইখের স্বভাবজাত-সুন্দর-বাচনভঙ্গি, আলোচনায় কুরআন-সুন্নাহর প্রায়োগিক উদ্ধৃতি এবং অকৃত্রিম-দরদপূর্ণ সম্বোধনে পাঠকমাত্রই প্রভাবিত হবেন, উজ্জীবিত হবেন বিস্তৃত ইমानी চেতনায়, অনুভব করবেন রব্বুল আলামীনের ভালোবাসার সীমাহীন স্নাদ, ইনশাআল্লাহ।

ইমান-আমলের চূড়ান্ত অবক্ষয় আর চিন্তা-চেতনার চরম বিপর্যয়ে নিপতিত বর্তমান মুসলিম সমাজের জন্য ড. ইয়াদ কুনাইবীর আলোচনা-সিরিজগুলো যে কতটা প্রয়োজনীয়, তা উম্মাহর চিন্তাশীল যে কেউই সহজে অনুধাবন করতে পারবেন। সে কারণে বাংলাভাষী পাঠকদের সাথেও ড. ইয়াদ কুনাইবীকে পরিচয় করিয়ে দেয়া ছিল সময়ের দাবি।

সিরিজটি যেহেতু ভিডিয়ো, তাই এর আলোচনার ধরনটা বক্তৃতা-ধর্মী। একে বইয়ের আঙ্গিকে সাজাতে এবং বাংলাভাষীদের বোধগম্য করতে অনুবাদের ক্ষেত্রে কিছুটা নিজস্ব হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। এছাড়া পাঠকের বোঝার সুবিধার্থে কিছু কিছু জায়গায় ভাবার্থকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কুরআনের আয়াত নম্বর, হাদীসের তথ্যসূত্র ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পাদটীকায় সংযোজন করা হয়েছে। নুসখা-পাভুলিপিভেদে হাদীসের নম্বরের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য হতে পারে।

সর্বোপরি সকল সীমাবদ্ধতা, ভুল-ত্রুটি আমার পক্ষ থেকে এবং পূর্ণতা ও সফলতা সব আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে।

‘মুনযিলে কুরআন’ রব্বুল আলামীনের দরবারে ফরিয়াদ, তিনি এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। এর ওসীলায় আমাদের অন্তরকে কুরআন দ্বারা আলোকিত করুন এবং কুরআনকে বানিয়ে দিন হৃদয়ের বসন্ত। আর বিচারের দিন ‘সাহিবে কুরআনের’ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শাফায়াতে একটু জায়গা নসিব করুন তাঁর আরশের নিচে-এক কোণে।

রহমানের দয়া-ভিত্তিক

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল জলিল

১৫. ১০. ২০২০

## কুরআন বোঝার নিয়ামাত

আল্লাহর কালাম বুঝতে পারা একটি নিয়ামাত। অনেক বড় নিয়ামাত। কারণ, কালামুল্লাহ'র অনুধাবন হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, অনুরাগ ও ভালোলাগা সৃষ্টি করে। কুরআন বোঝার মধ্য দিয়েই তৈরি হয় আত্মার পরিশুদ্ধি, হৃদয়ের পরিতৃপ্তি আর তাকদীরের ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্টি। কুরআন বোঝার মধ্য দিয়েই অর্জিত হয় ইয়াকীন ও সুদৃঢ় বিশ্বাস, অর্জিত হয় আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক ও দ্বীনি আত্মমর্যাদাবোধ, সৃষ্টি হয় আখিরাতের ফিকির এবং আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ প্রতিদান লাভের সজীব প্রত্যাশা। এ সবই অনেক বড় বড় একেকটি অর্জন।

বিশ্বাস ও ঈমানী আলোর বিচ্ছুরণের মূল উৎসও হচ্ছে কুরআন কারীমের উপলব্ধি। সুতরাং, কুরআন কারীম বুঝতে পারা এক বিশাল নিয়ামাত।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে সকলে এই নিয়ামাতের উপযুক্ত হতে পারে না। বিশেষ করে কিছু অকর্মণ্য লোক আছে। এরা যদি কুরআন বুঝত-ও, তবুও দুনিয়ার সস্তা-সামগ্রীকেই কুরআনের ওপর প্রাধান্য দিত তারা। ওইসব লোক আল্লাহর কালাম বুঝার নিয়ামাত পেয়ে যাবে, তা যেন স্বয়ং আল্লাহ তাবারকা ওয়া তাআলার আত্মসম্মানের পরিপন্থী!

আসলেই কি কিছু ব্যক্তি কুরআন বোঝার অনুপযুক্ত? কুরআনে কি এই দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ আছে?

উত্তর হলো, হ্যাঁ। বহু আয়াত রয়েছে। যেমন, সূরা ইসরার ৪৫ নং ও ৪৬ নং আয়াত দুটি,

وَإِذَا قُرَأَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا سُمْرًا ﴿٥١﴾  
وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِّرْتُ بِكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ



وَلَوْ اَعْلَىٰ اُذْبَارِهِمْ نُفُورًا ﴿٦٤﴾

‘যখন আপনি কুরআন তিলাওয়াত করেন, তখন আমি আপনার মাঝে আর পরকালে অবিশ্বাসীদের মাঝে একটি অদৃশ্য পর্দা দিয়ে দিই। আর তাদের অন্তরে তা অনুধাবনের ক্ষেত্রে আবরণ সৃষ্টি করে দিই আমি। তাদের কানে ছিপি মেরে দিই। আর যখন আপনি কুরআনে আপনার পালনকর্তার একত্ব আলোচনা করেন, তখন তারা অনীহাবশতঃ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়।’<sup>[১]</sup>

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার জন্য এটা আত্মমর্ষাদাবোধের প্রশ্ন যে, তাঁর কালামের নূর এ-সকল উদাসীন অন্তরে প্রবেশ করবে! তাই তিনি তাদের ও কুরআনের মাঝে একটি অদৃশ্য বাঁধার দেয়াল তৈরি করে দিয়েছেন। এতেই বোঝা যায় যে, তারা আসলে এই কুরআন বোঝার উপযুক্ত নয়।

কিন্তু কেন তারা কুরআন বোঝার যোগ্যতা হারাল?

আল্লাহ এর উত্তর দিয়েছেন পরের আয়াতেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰى اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿٧٤﴾ اَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

‘তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভালো করেই জানি। এও জানি যে, গোপনে আলোচনাকালে যালিমরা বলে, “তোমরা তো এক জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করছ।” দেখুন, তারা আপনার জন্যে কেমন উপমা দেয়। মূলত তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে; অতএব, ওরা (হিদায়াতের) পথ পেতে পারে না।’<sup>[২]</sup>

এদের অপরাধ ছিল, এরা রাসূল ﷺ-কে জাদুগ্রস্ত বলে দাবি করত। অথচ মনে মনে ঠিকই জানতো যে, তাদের এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

‘তারপরও যখন তারা এই বক্রতার পথ বেছে নিল, আল্লাহ তাআলাও তাদের অন্তরকে বাঁকা করে দিলেন।’<sup>[৩]</sup>

[১] সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৫-৪৬।

[২] সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৭-৪৮।

[৩] সূরা সফ, ৬১ : ৫।



অর্থাৎ, তাঁর পবিত্র কালাম বোঝার নিয়ামাত থেকে বঞ্চিত করলেন। এটা তাদের নিজেদেরই কর্মফল। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি মোটেও অন্যায় করেননি। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের ওপর সামান্য যুলুমও করেন না। বরং মানুষই নিজেদের ওপর যুলুম করে থাকে।’<sup>[৪]</sup>

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম رحمته الله বলেন,

وَمَنْ لَا يُجِبُ دَاعِيَ هَذَاكَ فَخَلَّه  
يُجِبُ كُلَّ مَنْ أَضْحَى إِلَى النَّعْيِ دَاعِيَا  
وَقُلْ لِلَّذِي قَدْ غَابَ يَكْفِي عُقُوبَةُ  
مَغِيبِكَ عَنْ ذَا الشَّانِ لَوْ كُنْتَ وَاعِيَا  
فَيَا مُحَنَّةَ الْحُسْنَاءِ تُهْدَى إِلَى امْرِئٍ  
صَرِيرٍ وَعَيْنَيْنِ مِنَ الْوَجْدِ خَالِيَا

যে ব্যক্তি হিদায়াতের পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না, তাকে ছেড়ে দাও;  
দেখবে, সে হাজার রকম ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারীদের ডাকে ঠিকই সাড়া দিচ্ছে।

আর যে দূরে ছিল তাকে বলে দাও,  
তোমার এই অনীহাই তোমার জন্য শাস্তি হিসেবে যথেষ্ট;  
সেই রূপসীর বেদনার কথা আর কী বলব,  
যাকে নপুংসক অন্ধের কাছে বিয়ে দেয়া হয়েছে!<sup>[৫]</sup>

নপুংসক সেই হতভাগার কথা ভেবে দেখুন, যে এক সুন্দরী রমণীকে স্ত্রী হিসেবে উপহার পেয়েছে। অথচ সে নিজে অন্ধ ও পৌরুষহীন। ঠিক তেমনিভাবে যে ব্যক্তি কুরআন কারীমের কদর করে না, সে কুরআন বোঝার উপযুক্ত না।

সুতরাং, আপনি যদি এর যথাযথ মর্যাদা বুঝে থাকেন তবে একে সযত্নে আগলে রাখুন; যতক্ষণ না আপনার কাছে এর উপযুক্ত অন্য কেউ আসে। অর্থাৎ, নিজে কুরআন বুঝুন এবং এর আদর্শ উত্তরাধিকার ও আগামী প্রজন্ম তৈরিতে সচেষ্ট হোন।

[৪] সূরা ইউনুস, ১০ : ৪৪।

[৫] মাদারিজুস সালিকীন, ৩/৩৩, ৩৪; দীর্ঘ কবিতার একাংশ।

### সারকথা:

১. কুরআন কারীম বোঝা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক বড় এক নিয়ামাত, বিশাল সম্মান ও মর্যাদার বিষয়।
২. সাবধান! সত্যের আহ্বান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। না হলে আল্লাহ আপনার এবং তাঁর কালামের মধ্যে অদৃশ্য পর্দা সৃষ্টি করে দেবেন। কারণ, অযোগ্য ব্যক্তি আল্লাহর কালাম বুঝুক, তা আল্লাহ তাআলার আত্মমর্যাদাবোধে বাধে।

## অন্তরের খোঁজ নিন

বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই নিজের শারীরিক সুস্থতার চেয়েও মানসিক তথা অন্তরের সুস্থতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য সে নিজেকে বারবার প্রশ্ন করে, ‘আমার অন্তর কি সুস্থ, নাকি রোগাক্রান্ত? আমার কলব কি কলবুন-সালীম (প্রশান্ত চিত্ত), নাকি এতে কোনো গোপন অসুখ বাসা বেঁধে বসে আছে?’

অন্তরের সুস্থতা পরীক্ষার একটি সহজ উপায় আছে। কোনো ল্যাভে বা পরীক্ষাগারে যাওয়ার ঝামেলা পোহাতে হবে না এতে।

কীভাবে?

শুধু যাচাই করুন যে, কুরআন আপনার মধ্যে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। ফলাফল পেয়ে যাবেন খুব সহজেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

‘আমি কুরআনে এমন কিছু অবতীর্ণ করেছি, যার মধ্যে মুমিনদের জন্য আরোগ্য ও রহমত রয়েছে। আর তা যালিমদের জন্য কেবল ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।’<sup>[৬]</sup>

যদি দেখেন যে, কুরআন আপনার অন্তরকে সুস্থ করছে, দুশ্চিন্তা দূর করছে; তা হলে আনন্দিত হোন, আপনি মুমিন! যখন যে অবস্থায়ই কুরআন পড়েন বা শোনে, অনুভব হয় যেন আল্লাহর রহমত আপনার চারপাশে ঘিরে আছে। হৃদয়কে করছে সুশীতল। এগুলো সবই মুমিনের লক্ষণ। কারণ, কুরআন শুধুমাত্র মুমিনদের জন্য শিফা-আরোগ্য-উপশম। সবার জন্য নয়।

[৬] সূরা ইসরা, ১৭ : ৮২।



পক্ষান্তরে কুরআন যদি আপনার অন্তরে নাড়া না দেয়, তাহলে দুঃসংবাদ। আল্লাহ মাফ করুন। কুরআন শোনার পরও গুনাহ থেকে ফিরে না আসা, নেক আমলে উদ্যমী না হওয়া, এগুলো পাপাচারী যালিমদের অবস্থা। তারা কু-প্রবৃত্তির গোলামি করে নিজেদের ওপর যুলুম করেছে আর ভ্রষ্টতার পথকে প্রসারিত করেছে। নিজেদের অন্তরকে বঞ্চিত করেছে যাবতীয় কল্যাণ থেকে, কুরআনের নিয়ামাত থেকে।

আল ইয়াযু বিল্লাহ! এসব থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় কামনা করি!

আল্লাহ তাআলা সূরা তাওবায় ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর তথা মুনাফিকদের এভাবে রূপায়িত করেছেন,

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا

‘আর যখন কোনো সূরা অবতীর্ণ হয়, তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের কার কার ঈমান বৃদ্ধি করল?’<sup>[৭]</sup>

মুনাফিকরা ঠাট্টার স্বরে বলাবলি করতে,

‘কুরআন না বলে ঈমান বাড়ায়? অ্যাঁই অমুক, তোমার ঈমান বেড়েছে নাকি?’

‘নাহ! কই?’

‘আমারও না। ধুর, এইসব ভুয়া!’

তাদের নির্বোধ আর পাথুরে অন্তরকেই ভাবতো স্বাভাবিক।

আল্লাহ তাআলা তাদের বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তার সমুচিত জবাব দিলেন যে, সমস্যা কুরআনের নয়। বরং সমস্যা তাদের নিজেদের মধ্যে। আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ বলছেন,

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

‘যারা মুমিন, এই সূরা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করেছে। তারা এতে আনন্দিতও বটে।’<sup>[৮]</sup>

কুরআন মুমিনদের অন্তরে ঈমান আরও মজবুত করে। ফলে নেককাজে আরও বেশি উদ্যমী হয় তারা। আর কুরআনে মুমিনদের জন্য যেসব প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা শুনে তাদের অন্তর পুলকিত হয়, প্রফুল্ল হয়।

পক্ষান্তরে যাদের অন্তর সত্য ও সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে,

[৭] সূরা তাওবা, ৯ : ১২৪।

[৮] সূরা তাওবা, ৯ : ১২৪।

তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছেন,

وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ

‘আর যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এটি তাদের কলুষতার সাথে আরেও কলুষতা বৃদ্ধি করে।’<sup>[৯]</sup>

যে নিজের কু-প্রবৃত্তির গোলামি করে অন্তরকে কলুষিত করে ফেলছে, কুরআন শুনে তার অন্তরের কলুষতা আরও বৃদ্ধি পায়। কুরআনে তো সব তার প্রবৃত্তির বিপরীত আদেশ-নিষেধ। এসব শুনে বা পড়ে তার কাছে পছন্দ হয় না। কুরআনের বিধান অপছন্দনীয় মনে হয় তার কাছে। আল্লাহ আমাদের এমন ব্যাধি হতে রক্ষা করুন।

প্রিয় পাঠক! এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, এগুলো নবি-যুগের নির্দিষ্ট একদল মুনাফিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরবর্তীতে বুঝি এর কোনো পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। বরং এই সমস্যা আমাদের প্রত্যেকের নিজের মাঝে খোঁজা উচিত। আমার মাঝেও মুনাফিকদের ওই বদস্বভাব নেই তো?

যেমন, মনে করুন, অফিসে যেতে যেতে বা দোকান খোলার সময় মোবাইলে কুরআনের তিলাওয়াত শুনছেন। তারপর কয়েক মিনিট পরই চালু করে দিচ্ছেন মিউজিক ভিডিও, অল্লীল গান, নাটক, সিনেমাসহ এমন হাজারো কিছুর; যা আপনাকে অবিরাম ডাকছে গুনাহের দিকে। আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাস-বেখবর রাখছে।

কী? কুরআন কি আপনার ঈমান বৃদ্ধি করেছে?

যদি করত, তাহলে কি কুরআন শোনার পরও পাপাচারে লিপ্ত হতে পারতেন? পারতেন এসব অল্লীল-অহেতুক কাজে গা ভাসাতে?

### সারকথা:

আপনার মধ্যে কুরআনের প্রভাব কতটুকু, তা যাচাই করুন। এটি অন্তরের সুস্থতা-অসুস্থতা নির্ণয়ের এক অব্যর্থ চেকআপ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে কলবুন সালীম তথা সুস্থ-অন্তর দান করুন। আমীন।

[৯] সূরা তাওবা, ৯ : ১২৫।



## চিঠি এসেছে...

মনে করুন, দেশের সর্বোচ্চ বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিটি আপনার কাছে একটা চিঠি পাঠাল। সে বেশ আন্তরিকতার সাথে লিখল,

‘আমি আপনার একান্ত কল্যাণকামী, আপনার জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ কামনা করি। আমি চাই, আপনি আমার ঘনিষ্ঠ ও কাছের মানুষ হোন এবং আমার অর্থ-বিত্ত আর ঐশ্বর্য থেকে আপনার সকল প্রয়োজন পূরণ করুন।’

একটু ভাবুন তো, এই চিঠি আপনাকে কতটা আনন্দিত করবে!

হয়তো আপনি সেটাকে ফ্রেমে বাঁধাই করে রাখবেন। বারবার পড়বেন চিঠির প্রতিটি শব্দ। বলে বেড়াবেন আশেপাশের সবাইকে। হতে পারে গুনগুন করে গানও গাইবেন!

কিন্তু দেখুন, এই নামিদামি ব্যক্তি আসলে কে? এই পৃথিবীতে বসবাস করা কোটি কোটি মানুষের মধ্যে একজন মানুষই তো।

আর এই পৃথিবীই বা কতটুকু? পৃথিবী তো হচ্ছে এর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড় সূর্যের আওতাভুক্ত বিশাল সৌরজগতের একটি গ্রহ মাত্র।

আবার এই সূর্য? সে তার মতো বা তার চেয়েও বড় কোটি কোটি নক্ষত্র নিয়ে গঠিত মিল্কিওয়ে বা ছায়াপথের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ।

মহাবিশ্বে মিল্কিওয়ের মতো এমন কোটি কোটি গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ রয়েছে। Hale, Hubble, BTA-6 সহ বিভিন্ন টেলিস্কোপে ধরা পড়েছে এগুলো।

আমরা জানি, আলোর গতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার। মাত্র ০.১২ সেকেন্ডেই আলো পৃথিবীর পরিধি অতিক্রম করতে পারে। আবার কিছু ছায়াপথ আমাদের পৃথিবী থেকে এত দূরে যে, এরকম গতিসম্পন্ন আলো কোটি কোটি বছর



ধরে পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে কিন্তু এখনো তা পৃথিবীতে পৌঁছেনি। সর্বশেষ ২০১১ সালের ২৬ জানুয়ারি নাসা (NASA) যেই ছায়াপথটি আবিষ্কার করেছে, তা পৃথিবী থেকে প্রায় ১৩.২ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে!

এই সবকিছু দিয়ে আল্লাহ তাআলা কেবল দুনিয়ার আকাশ অর্থাৎ প্রথম আসমান সাজিয়েছেন। অগণিত ফেরেশতা অবিরত তার তাসবীহ পাঠ করেছে বাকি ছয় আসমানে। সেগুলোর পরিধি যে কতটুকু, তা তো আল্লাহই ভালো জানেন! বলাবাহুল্য, এই সাত আসমান আবার আল্লাহ তাআলার আরশের তুলনায় কিছুই নয়।

আর সেই আরশের মালিক মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা; তিনি স্বয়ং আমাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন—‘আল-কুরআন’।

সেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তিনি আমাদের ভালোবাসেন, আমাদের ওপর দয়া করতে চান, আমাদের অন্যায়-অপরাধ ক্ষমা করতে চান, আমাদের দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণ চান। আমাদের নিয়ামাত দিতে চান, চান তাঁর নৈকট্য-দানে ধন্য করতে এবং আরও চান তাঁর বিশেষ-আশ্রয়ে রহমতের চাদরে আমাদের আবৃত করতে।

তা হলে সেই কুরআনের ব্যাপারে আমাদের আনন্দ-উচ্ছাস কতটুকু হওয়া উচিত?

প্রিয় ভাই ও বোন আমার, আল্লাহ তাআলার এই আয়াতটি পড়লে তার মর্মার্থ আমাদের কিছুটা বুঝে আসার কথা-

وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“আর এটা তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।”<sup>[১০]</sup>

ভাবতে পারেন, ‘বিশ্বজাহানের প্রতিপালক’ মানে কী? কাকে বলে ‘রব্বুল আলামীন’?

আল্লাহ তাআলা আরও বলছেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٥﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٨٥﴾

‘হে মানবজাতি, তোমাদের কাছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে; যা অন্তরের রোগ নিরাময় করে। যা মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (হে নবি) আপনি বলুন, আল্লাহর এই দয়া ও অনুগ্রহের ব্যাপারে যেন তারা আনন্দিত হয়। তারা যা জমা করে রাখে, তা থেকে এটা উত্তম।’<sup>[১১]</sup>

[১০] সূরা শুআরা, ২৬ : ১৯২।

[১১] সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৭-৫৮।

আল্লাহর বিশাল সৃষ্টির মাঝে, তাঁর রাজত্বের কাছে মানুষ একেবারেই নগণ্য। সেই আমাদের মতো তুচ্ছ মানবজাতিকে মহান আল্লাহ তাআলা সম্বোধন করেছেন! এই সম্মানের কি কোনো তুলনা হয়?

দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা তো সাধারণ প্রজাদের সাথে কথাই বলতে চায় না। সেখানে সকল বাদশাহর-বাদশাহ, রাজাধিরাজ আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদের সাথে কথা বলছেন! এরচেয়ে মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে?

মোটকথা, যখনই কুরআন পড়বেন বা শুনবেন, মনে রাখবেন, এটা আল্লাহর কালাম। তিনি বিশ্বজাহানের পালনকর্তা। তিনি চান আপনাকে সম্মানিত করতে, আপনার মর্যাদা উঁচু করতে, আপনাকে সৌভাগ্যবান করতে। আর তাই তো আপনাকে সম্বোধন করেছেন, ডাক দিয়েছেন রহমতের স্বরে! দয়াভরা আওয়াজে!

## আল্লাহর রশি

মনে করুন, আপনি একটি খাদের কিনারা দিয়ে পথ চলছেন। হঠাৎ পা পিছলে গেল! পড়ে যাচ্ছেন খাদে! এখন কী দরকার? শক্ত একটি দড়ি। ওপর থেকে কেউ সেটা শক্ত করে টেনে ধরবে। আর আপনি তার সাহায্যে উঠে আসবেন ওপরে।

এই কুরআন হলো আল্লাহর রশি। আল্লাহ এবং আমাদের মধ্যকার বন্ধনরজ্জু। এর মাধ্যমেই তিনি আমাদের টেনে তুলবেন; উদ্ধার করবেন জাহান্নামের ভয়াবহ অগ্নিখাদে পতিত হওয়া থেকে। কুরআনে কোথাও বলা হয়েছে এ কথা? হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

‘তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো। বিচ্ছিন্ন হয়ো না।’<sup>[১২]</sup>

আসুন, ‘আল্লাহর রশি’ নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করি।

ইমাম আবু বকর ইবনুল আরাবি তার আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, ‘এটা তো স্পষ্ট যে, এখানে “আল্লাহর রশি” মানে আল্লাহর কিতাব।’<sup>[১৩]</sup>

সহীহ মুসলিমে উদ্ধৃত হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَلَا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، هُوَ حَبْلُ اللَّهِ، مَنْ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ

[১২] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১০৩।

[১৩] আহকামুল কুরআন, ১/৩৮১।



‘আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারি জিনিস রেখে যাচ্ছি। একটি হলো আল্লাহর কিতাব, এটি আল্লাহর রশি। যে এর অনুসরণ করবে, সে হিদায়াতের পথে থাকবে। আর যে একে ছেড়ে দেবে, সে লিপ্ত হবে পথভ্রষ্টতায়।’<sup>[১৪]</sup>

এই কুরআনের রজুই হচ্ছে আমাদের সাথে আল্লাহ তাআলার সম্পর্কের সেতুবন্ধন।

আবু শুরাইহ খুযায়ি রাঃ বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبَشِّرُوا وَأَنْبِشِرُوا، أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفُهُ بِأَيْدِيكُمْ، فَتَمَسَّكُوا بِهِ، فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا، وَلَنْ تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا

একবার রাসূল সঃ আমাদের কাছে এসে বললেন, ‘সুসংবাদ! সুসংবাদ! তোমরা তো সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল; তাই না?’ সাহাবিগণ বললেন, ‘অবশ্যই।’ তিনি বললেন, ‘(তবে তো সুসংবাদ!) এই কুরআন হচ্ছে এমন এক মাধ্যম (অর্থাৎ রশি,) যার একপ্রান্ত আল্লাহর হাতে এবং আরেক প্রান্ত তোমাদের হাতে। যদি তোমরা এটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, সর্বনাশের শিকার হবে না।’<sup>[১৫]</sup>

কিন্তু আমরা কী করছি? আমরা কি আমাদের দিক থেকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরছি?

যদি অতিসত্বর শক্ত করে এ রশি আঁকড়ে ধরতে পারি, তবে আর খাদে পড়ে যাবার ভয় নেই। যত বেশি মজবুত করে আঁকড়ে থাকতে পারব, ততই বাড়তে থাকবে মুক্তির সম্ভাবনা।

পক্ষান্তরে যদি শিথিল করে দিই হাতের কজি, জাহান্নামের খাদে পতিত হবার পথ ক্রমেই কাছে চলে আসবে। অবহেলায় হঠাৎ হয়তো পড়ে যাব জাহান্নামের অতল অগ্নিগর্ভে!

সে দোষ রশির নয়। যিনি ওপর থেকে ধরে রেখেছেন, তারও নয়! সে দায় কেবল আমাদের নিজেদেরই নিতে হবে!

তাই, আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরুন। আল্লাহ তাআলা সূরা যুখরুফে বলেন,

فَاسْتَنْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

‘অতএব, আপনার প্রতি যে ওহি নাযিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরুন

[১৪] মুসলিম, ২৪০৮; ই.ফা. ৬০১০।

[১৫] মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ, ৩০০০৬, সনদ হাসান।

(অনুসরণ করুন); নিঃসন্দেহে আপনি সবল পথে রয়েছেন।<sup>[১৬]</sup>

দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা মানে শুধু কক্তির ব্যবহার নয়। প্রয়োজনে দাঁত কামড়ে ধরতে হবে। হাত-পা-শরীর দিয়ে যেভাবে পারি, পৌঁচিয়ে রাখতে হবে। কিছুতেই যাতে ছুটে না যায়।

### সারকথা:

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেতে কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে রশিদরূপ। আমরা যত বেশি মজবুত করে কুরআনকে আঁকড়ে ধরব, মুক্তির পথ ততটাই ত্বরান্বিত হবে।

[১৬] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৩।

## মর্যাদার সোপান

বিগত পাঠের আলোচনাসূত্রে আমরা দেখেছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

“অতএব, আপনার প্রতি যে ওহি নাযিল করা হয়, তা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরুন (অনুসরণ করুন)। নিঃসন্দেহে আপনি সরল পথে রয়েছেন।”<sup>[১৭]</sup>

এই আয়াতের পরেই আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা নতুন আরেক প্রসঙ্গ এনেছেন, যারা কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে, কুরআনময় জীবন গড়েছে, তাদের মর্যাদার কথা, শ্রেষ্ঠত্বের কথা। আল্লাহ বলেছেন,

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

‘আর নিশ্চয়ই এই (কুরআন) আপনার এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ (অর্থাৎ, সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য উপদেশ)। আর অচিরেই তোমরা (এ ব্যাপারে) জিজ্ঞাসিত হবে।’<sup>[১৮]</sup>

আল্লাহ তাআলা যে রশির এক প্রান্তে ধরে রেখেছেন, সেই রশির অপর প্রান্ত ধারণকারীদের প্রতিদান তো এমনই হবে!

এই একই অর্থে আরও কিছু আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

[১৭] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৩।

[১৮] সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৪।



‘আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্য (মর্যাদাপূর্ণ) উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না?’<sup>[১৯]</sup>

ইমাম ইবনু কাসীর বলেন, এই আয়াতে কুরআনের মর্যাদার ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। উৎসাহ দেয়া হয়েছে কুরআনের মর্যাদা বোঝার ব্যাপারে।

ইবনু আব্বাস রাঃ বলেন, এই আয়াতে ‘তোমাদের যিকর’ দ্বারা উদ্দেশ্য ‘তোমাদের মর্যাদা’<sup>[২০]</sup> অর্থাৎ, যে কুরআনকে আঁকড়ে ধরবে, তার জন্য কুরআন ইয্যাত-সম্মান আর শ্রেষ্ঠত্বের কারণ হবে। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গায়ই সম্মানের সাথে স্মরণ করা হবে তাকে।

একটু গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন- আল্লাহ তাআলা কী বোঝাতে চাচ্ছেন-

‘আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে (মর্যাদাপূর্ণ) উপদেশ রয়েছে।’

আমরা কি বুঝি না?

আমরা কি এই মহান মর্যাদার কথা বুঝি না?

বুঝে থাকলে কেন কুরআনের তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকছি?

আমরা কি বুঝি না? তবে কেন কুরআন নিয়ে ভাবছি না?

আমরা কি বুঝি না? তবে কেন মহান রব্বুল আলামীনের কালাম থেকে মুখ ফিরিয়ে অহেতুক খেল-তামাশায় ডুবে আছি? কেন সেসব অশ্লীল গান-বাজনা নিয়ে পড়ে আছি, যা আমাকে রব্বুল আলামীনের অবাধ্যতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে?

মূসা রাঃ তাঁর উম্মাতকে প্রশ্ন করেছিলেন,

أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

‘তোমরা কি উত্তম জিনিসের বিনিময়ে নিকৃষ্ট জিনিস পেতে চাও?’<sup>[২১]</sup>

কোনো বিবেকবান কি এমনটা করে!

তা হলে আমাদের বিবেকের কী হলো?

কেন আমরা কুরআন অনুযায়ী আমল করছি না?

আসলে রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর ওই কথাটি-ই ঠিক:

[১৯] সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১০।

[২০] তাফসীর ইবনু কাসীর ৫/২৯৩।

أُتِّبْدُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে কিছু জাতিকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন আর বাকিদের অবদমিত করে রাখবেন।’<sup>[২২]</sup>

অতএব, যে কুরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে, আল্লাহ তাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবেন, শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন। দুনিয়াতেও, আখিরাতেও।

## অশ্রুসজল চোখ

মারোমধ্যে মনে একটা প্রশ্ন জাগে। আমাদের কুরআন পড়া, কুরআন শোনা কেন সাহাবিদের মতো হয় না?

তারা যেভাবে কুরআনকে অনুভব করতেন, আমরা কেন সেভাবে অনুভব করতে পারি না?

তারা যেভাবে অঝোরে কাঁদতেন, আমরা কেন সেভাবে কাঁদতে পারি না?

এর উত্তর কী?

উত্তর হলো, তারা যে মানসিকতা নিয়ে কুরআন পড়তেন, তা মোটেও আমাদের মন-মানসিকতার মতো ছিল না।

তাদের মানসিকতা ছিল এক নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকের মতো, যে সার্বক্ষণিক কমান্ডারের আদেশ পালনের অপেক্ষায় থাকে। তার হৃদয়ে আছে আশা, ভয় আর ভালোবাসার এক মোহনা।

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

‘কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর জন্য এটা কখনোই সমীচীন নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন আর তারা সেটা ঐচ্ছিক হিসেবে গ্রহণ করবে।’<sup>[২৩]</sup>

আল্লাহর এই বাণী সাহাবিদের চেয়ে আর কে ভালো বুঝবে? তা বাস্তবায়নে তাদের চেয়ে কে বেশি অগ্রগামী হবে? আল্লাহর আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে ইচ্ছের মানদণ্ডে

[২৩] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬।



দাঁড় করানো যায়, সেটা তারা কল্পনাও করতে পারতেন না।

তারা পথহারা নাবিকের মতো প্রতীক্ষায় থাকতেন, কুয়াশার বুক চিরে, প্রদীপ্ত তারকা হয়ে কখন নাযিল হবে কালামুল্লাহর আয়াত। পথ দেখাবে জীবনসিন্ধুর নিকষ আঁধারে।

তাদের অন্তরগুলো চৈত্রের খাঁ খাঁ দুপুরের চৌচির জমিনের মতো অপেক্ষায় থাকতো, শ্রাবণের বারিধারা হয়ে কখন নামবে আল্লাহর বাণী। সিক্ত হবে অন্তর-ভূমি, পরিপূর্ণ হবে ঈমানের সজীবতায়।

তাদের তনুমনের সাধনা ছিল একটাই; ‘আমার আল্লাহর আদেশ কীভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তার সর্বোচ্চ পছন্দমত পন্থায়!’

এমন পবিত্র-নির্মল মহাত্মাদের কাছে যখনই কোনো ওহির বিধান আসতো, তাদের অন্তর বাঁধাহীনভাবে ছুটে যেতো সেদিকে। আল্লাহর ভালোবাসা আর ভয়ে কম্পিত হয়ে কণ্ঠ, দুচোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়তো মালিকের ভালোবাসার অশ্রুফোঁটা!

এদিকে আমাদের অবস্থা?

আমরা অনেকেই কেমন যেন একটা গা-ছাড়া ভাব নিয়ে কুরআন পড়ি। কুরআনের বর্ণমালা পড়ছি ঠিকই। কিন্তু কেমন যেন তার বিধানগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে।

যেমন, কুরআনের কোনো একটি বিধান আমি পালন করতে আগ্রহী না কিংবা আমার মতের সাথে খুব একটা যায় না, সেই আয়াত পড়ার সময় আমরা কী করি?

সেই বিধান থেকে মুক্তি(!) পেতে অজুহাতের পসরা সাজিয়ে বসি!

এরপর নিজেদের প্রবৃত্তির থলে থেকে যেসব ব্যাখ্যা-নামের-অপব্যাখ্যা দিতে শুরু করি, তার তো কোনো শেষ-ই নেই:

‘আরে এই আয়াতের তাফসীর ভিন্ন কিছু!’

‘হয়তো বিষয়টা নিয়ে মতভেদ আছে!’

‘ওও! এটা তো এই যুগের জন্য প্রযোজ্য নয়!’

‘এটা পালন করা তো একেবারে অসম্ভব। তবে যেহেতু আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু; তিনি ক্ষমা করে দেবেন।’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই বিষয়গুলোতে আমরা নিজেদের বিবেকের কাছেও প্রশ্নের সম্মুখীন হই। আমাদের বিবেক-ই আমাদের ভৎসনা করে কুরআনের এই আয়াত স্মরণ করিয়ে দেয়:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

‘হে ঈমানদারগণ, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের আহ্বান করেন,

তখন তাঁদের ডাকে সাড়া দাও। (আর তা) এজন্য যে (তাতে যা আছে) তা তোমাদের জীবন দান করে।<sup>[২৪]</sup>

এরপর একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে যাই আমরা। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। কিন্তু পরদৃষ্টিই বিবেকের এই আহ্বান না বোঝার ভান করে এড়িয়ে যাই। তারপর সামনে তিলাওয়াত করা শুরু করি। এভাবেই চলতে থাকে- দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর....।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, এসবের পরও আমরা আশায় থাকি যে, কুরআন আমার মধ্যে আমলের জয়বা সৃষ্টি করবে। অন্তরে প্রভাব বিস্তার করবে, ঠিক সাহাবিদের মতো।

প্রিয় ভাই ও বোন!

যদি সত্যিই কুরআনের মাধ্যমে সাহাবিদের মতো প্রভাবিত হতে চান, তবে একটি সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আল্লাহর আনুগত্যকে ঐচ্ছিক ভাবা চলবে না।

না! এখানে ঐচ্ছিক কোনো ব্যাপার-সাপার নেই। আমার সামনে একটাই পথ, আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলার আনুগত্য। শর্তহীন আনুগত্য। মন-মননে এটাই গেঁথে ফেলতে হবে।

এই সিদ্ধান্ত নেয়াটা কঠিন। কিন্তু একটা ব্যাপার মনে রাখবেন। আল্লাহ আপনাকে যে আদেশই দেন, তা আপনার জন্য সহজ করেই দেন। আপনার দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া কিছু থাকে না সেখানে। আল্লাহ তাআলার হিকমাহ-প্রজ্ঞার প্রতি এরকম পূর্ণ আস্থা থাকলে সিদ্ধান্ত নেয়া আর কঠিন মনে হবে না।

সাহাবায়ে কেরাম কুরআন কারীমে আল্লাহর আদেশ পেলে কীভাবে সাড়া দিতেন, তার কিছু নমুনা আল্লাহ চাইলে আমরা সামনে আলোচনা করব। যাতে আমরাও তাদের অনুগামী হতে পারি। আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরকেও তাদের অন্তরের মতো সজীব-সচেতন করে দেবেন।

সেজন্য কিন্তু আগে এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, ‘আল্লাহর আনুগত্য ছাড়া আমার আর কোনো বিকল্প নেই।’ কারণ,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

‘কোনো মুমিন পুরুষ বা মুমিন নারীর জন্য এটা কখনোই সমীচীন নয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন আর তারা সেটা ঐচ্ছিক হিসেবে গ্রহণ করবে।’<sup>[২৫]</sup>

[২৪] সূরা আনফাল, ৮ : ২৪।

[২৫] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৬।



## পরিস্থিতি যখন প্রতিকূল

কখনো কখনো আমরা এমন কিছু বলে বসি, এমন কিছু করে বসি, যা আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে। এরপর অজুহাত দাঁড় করাই, ‘রাগে মাথা ঠিক ছিল না, হয়ে গেছে!’

বেমালুম ভুলে যাই যে, অনুভূতি প্রকাশের বেলায়ও আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করতে হবে। রাগ না করাটাও আল্লাহর একটি আদেশ।

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

‘যারা স্বচ্ছলতায় ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের রাগকে সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, বস্তৃত আল্লাহ (সেসব) সংকর্মশীলদের ভালোবাসেন।’<sup>[২৬]</sup>

হাদীসেও এসেছে,

لَا تَغْضَبْ

‘রাগ করো না।’<sup>[২৭]</sup>

যেহেতু ‘আল্লাহ তাআলা কারও ওপর তার সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দেন না’ এবং তিনি আমাদের রাগ না করার আদেশ দিয়েছেন; অতএব, রাগ দমন করা আমাদের সাধ্যাতীত কিছু না। কোনো রকম ওজর হিসেবেও রাগ গ্রহণযোগ্য নয়।

[২৬] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১৩৪।

[২৭] বুখারি, ৬১১৬।



এবার দেখি, সাহায্যে কেরামের অবস্থা কী। রাগের মুহূর্তে তারা কীভাবে আল্লাহর আদেশে সাড়া দিতেন?

সহীহ বুখারির একটি ঘটনায় আমরা এর উত্তর খুঁজে পাই।

আমীরুল মুমিনীন উমার রাঃ-এর একজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ছর ইবনু কায়স। তিনি আহলুল কুররার<sup>[২৮]</sup> অন্তর্ভুক্ত। জাতি-বর্ণ আর বংশগৌরবকে প্রাধান্য দিতেন না উমার। তাই স্বভাবত এরকম মানুষেরাই হতেন উমারের পরামর্শদাতা।

তো, এই ছর ইবনু কায়সের এক চাচার নাম উয়াইনা ইবনু হিসন। তিনি মদীনায়ে এসে ভাতিজার কাছে দাবি করলেন, সে যেন তাকে আমীরুল মুমিনীনের কাছে নিয়ে যায়। এরপর একদিন তারা দুজন উমার রাঃ-এর দরবারে এলেন। সম্ভবত খলিফার কাছে কোনো দান-দক্ষিণার আবদার নিয়ে এসেছিলেন উয়াইনা।

এখানে আমরা কেমনটা আশা করি? তিনি প্রথমে সালাম দেবেন—‘আসসালামু আলাইকুম, ইয়া আমীরাল মুমিনীন’ বলে সম্মানসূচক সম্বোধন করবেন, তারপর নিজের আর্জি পেশ করে বলবেন, ‘অমুক কাজে আমার এত টাকা লাগবে... জাযাকুমুল্লাহ খাইর’ ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু উয়াইনা কী করলেন? তিনি আমীরুল মুমিনীনের দরবারে ঢুকেই বলে বসলেন, ‘খাত্তাবের বেটা! আল্লাহর কসম, আপনি আমাদের খুব একটা দানও করেন না, আর না ইনসাফ অনুযায়ী শাসন করেন!’

ইয়া ফাতাহ ইয়া কারীম! ইয়া রায়যাক ইয়া আলীম!

তিনি করলেনটা কী!

না সালাম, না ‘আমীরুল মুমিনীন’ বলে সম্বোধন; এমনকি ‘উমার’ নামটাও ঠিকমতো বললেন না! ঢুকেই দায়িত্বে অবহেলার অপবাদ ঠুকে বসলেন! তাও আবার কসম খেয়ে।

আর বললেন কাকে? ন্যায়-ইনসাফের মূর্ত প্রতীক উমারকে!

উয়াইনা হয়তো চেয়েছিলেন এসব কথা বলে উমারকে উত্তেজিত করে দিতে, যাতে তিনি এই অভিযোগ ভুল প্রমাণ করতে একটা বড় অংকের অর্থ দিয়ে দেন!

কিন্তু উমার রাঃ রেগে গেলেন। কিছু একটা করেই ফেলবেন তাকে। আর বাস্তবেও এই পরিস্থিতিতে রাগ আসারই কথা!

একটু ভাবুন তো, ছর ইবনু কায়স তার চাচার এহেন আচরণে কতটা লজ্জা পেয়েছিলেন?

[২৮] যারা কুরআনের ইলম এবং আমল ধারণ করেন।

তবুও তিনি সংযত হয়ে উমারকে বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাআলা তার নবিকে বলেছেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

‘(হে নবি) ক্ষমার পথ অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ দিন আর জাহিলদের উপেক্ষা করে চলুন।’<sup>[২৯]</sup>

আর আদবকেতা না জানা ওই চাচা মিয়া তো জাহিলই বটে।

ইবনু আব্বাস রাঃ বলেন, ‘আল্লাহর কসম! যখন তার সামনে এই আয়াত পড়া হলো, তিনি আর সামনে অগ্রসর হননি।’ অর্থাৎ, আয়াতের বিপরীত আমল করেননি। ‘আর (উমারের স্বভাব তো ছিল এমন) তিনি আল্লাহর কিতাবের সামনে একেবারে নিশ্চুপ হয়ে যেতেন।’<sup>[৩০]</sup>

কিতাবুল্লাহর একটি আয়াত উমারের রাগকে, হ্যাঁ, উমারের রাগকে পানি করে দিলো, তাকে প্রতিশোধ নেয়া থেকে বিরত রাখল।

প্রিয় পাঠক!

এতে কি উমারের মর্যাদা কমে গেছে, নাকি তার মান-মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে?

বরং বৃদ্ধিই পেয়েছে, আল্লাহর কাছে এবং আল্লাহর বান্দাদের কাছেও।

অতএব এটা বলবেন না যে, ‘রাগের মাথায় কতকিছু হয়ে যায়, অত ভাবা যায় নাকি!’

মনে করবেন না যে, রাগের মাথায় করলে সাতখুন মাফ। যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারব।

বরং কিতাবুল্লাহর সামনে মোমের মতো গলে যান। ঠিক উমারের মতো। আল্লাহ তাআলা আপনাকেও দুনিয়া আখিরাতে সম্মানিত করবেন।

তাই কেউ যদি আপনার সাথে খারাপ আচরণ করে কিংবা বদনাম করে, তাহলে স্মরণ করুন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

‘(হে নবি) ক্ষমার পথ অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ দিন আর জাহিলদের উপেক্ষা করে চলুন।’<sup>[৩১]</sup>

[২৯] সূরা আরাফ, ৭ : ১৯৯।

[৩০] বুখারি, ৪৬৪২, ৭২৮৬।

[৩১] সূরা আরাফ, ৭ : ১৯৯।



## সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য

কুরআন-প্রেমী ভাই ও বোন আমার!

ঈমানের বলে বলীয়ান সাহায্যে কেরাম এমন অবস্থায়ও আল্লাহর আদেশে সাড়া দিয়েছেন, যেটা রাগের চেয়েও কঠিন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায়!

আনাস ইবনু মালিক রাঃ মদ হারাম হওয়ার একেবারে পূর্ব-মুহূর্তের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন:

একবার আবু তালহা, আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ, মুআয ইবনু জাবাল, সুহাইল ইবনু বাইদা, আবু দুজানা প্রমুখের সামনে মদ পরিবেশন করছিলাম আমি। নেশার ঘোরে তাদের মাথা ঢুলে পড়ছিল।

এমন সময় আচমকা একজন ঘোষণা করল, ‘সাবধান! মদ হারাম করা হয়েছে!’

দেখুন এবার, ইলাহী-নির্দেশ তাদের ঈমানে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। অথচ মন তখনো মদের প্রভাবে পর্দাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

আনাস রাঃ বলেন, ‘আমরা (সাথে সাথে) মদ ফেলে দিলাম।’

চিন্তা করুন, এই নেশার ঘোরেও আল্লাহর আদেশ পালনের আগ্রহ কতটা প্রবল! মদ থেকে বাঁচতে পাত্রগুলোও ফেলে দিলেন তৎক্ষণাৎ।

তিনি বলেন, ‘আমরা মদ রাখার পাত্রগুলো ভেঙে চুরমার করে ফেললাম। যেন সেই ঘোষণাটি ছিল আমাদের জন্যই, যেন আমরা মদের সাথে চিরদিনের জন্য সব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলি।

এরপর কেউ ওয়ু করলাম, কেউ গোসল করলাম এবং উম্মু সুলাইমের কাছ থেকে



সুগন্ধি নিয়ে বের হলাম মাসজিদের দিকে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ  
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ  
﴿١٩﴾

‘হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক তীর এগুলো সব শয়তানের নাপাক কার্য বৈ কিছুই নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো, যাতে কল্যাণপ্রাপ্ত হও। শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে। তা হলে (শয়তানের ধোঁকায় পড়ে) তোমরা কি (আমল থেকে) নিবৃত্ত হয়ে যাবে?’ [৩২:১৯]

১৯২০ সালে আমেরিকায় এ্যালকোহল (মদ) নিষিদ্ধ করে আইন জারি করা হয়েছিল। এরপর ব্যাপক বিক্ষোভ-বিদ্রোহ দেখা দেয় সেখানে। এই আইনের বিরুদ্ধাচরণকারী প্রায় পাঁচ লাখ নাগরিককে বন্দি করা হয়। আন্দোলন দমন করতে হত্যা করা হয় বিরোধী পক্ষের প্রায় দুইশত লোক। এরপর ১৯৩৩ সালে মার্কিন কংগ্রেস বাধ্য হয়ে আইন বাতিল করে এবং পুনরায় মদের অনুমতি দেয়।

এবার ধূমপায়ী ভাইদের বলছি। বলুন তো কোনটা বেশি সহজ, সাহাবিদের মদ ছেড়ে দেয়া নাকি আপনার ধূমপান ছেড়ে দেয়া?

উত্তরটা ঈমানের ওপর নির্ভর করে।

নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুযায়ী, মদ এবং ধূমপান উভয়ই নেশাজাতীয় দ্রব্য। [৩৪] এ ধরনের অভ্যাস হঠাৎ করে ত্যাগ করলে শরীরে বিভিন্ন অস্বাভাবিক উপসর্গ দেখা দেয়। এগুলোকে বলে withdrawal syndrome. আর বলাবাহুল্য, মদ ছেড়ে দেয়ার পর শরীরে যেসব কষ্টকর উপসর্গ দেখা দেয়, সিগারেট ছেড়ে দিলে অতটা হবে না। কারণ, মদের প্রভাব শরীরে এত তীব্র হয় যে, হঠাৎ করে মদ ছেড়ে দিলে মৃত্যুও হতে পারে!

[৩২] সূরা মাইদা, ৫ : ৯০-৯১।

[৩৩] মুসনাদু বাযযার, ৭২৮৮, ইমাম হায়সামির মতে সনদ হাসান; মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮০৭৭, সহীহ সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে: মুসনাদু আহমাদ, ১৩৩৭৬; বুখারি, ২৪৬৪, ৪৬২০; মুসলিম, ১৯৮০।

[৩৪] এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং অবশ্য পরিত্যাজ্য। দারুল উলুম দেওবন্দের অনলাইন ফতোয়া নং ৩৫৬৫৫-এ তামাকজাত জর্দা ও ধূমপানকে মাকরুহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। লিংকঃ <https://darulifta-deoband.com/home/ur/halal-haram/৩৫৬৫৫>

হয়তো বলবেন, ‘মদ তো ধাপে ধাপে হারাম করা হয়েছিল।’

হ্যাঁ, ঠিক আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখনো তো মদ তাদের অস্থি-মজ্জায় মিশে ছিল। আর এটা তো বোঝাই যাচ্ছে যে, সাহাবায়ে কেরামের একটা বড় অংশ মদ ছেড়ে দিয়েছেন একদম হঠাৎ করেই। এর জন্য তাদের কত রকম withdrawal syndrome এর শিকার হতে হয়েছিল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু দেখুন, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাদের জ্ঞানে-প্রাণে কতটা মর্যাদা দিয়েছেন!

হাদীসে আমরা যেসব সাহাবিদের কথা উল্লেখ করলাম, প্রত্যেকেই কিন্তু একেকজন বড় বড় মাপের সাহাবি। আবু উবাইদা, মুআয ইবনু জাবাল, আবু দুজানা। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তৎক্ষণাৎ মদ ছেড়ে দিয়েছেন। বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাদের নির্বাচিত করেছেন ইলম, জিহাদ ও শাহাদাতের মতো বড় বড় সম্মানের জন্য। ‘যে আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করে, আল্লাহ এর বিনিময়ে আরও উত্তম কিছু দান করেন।’

তাই যাদের মাঝে আল্লাহর অপছন্দনীয় কোনো স্বভাব আছে, তারা আল্লাহর আহ্বানটা একটু স্মরণ করুন,

فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

‘তবে কি তোমরা (আল্লাহর আদেশ থেকে) নিবৃত্ত থাকবে?’

সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে সাড়া দিয়েছেন, সেভাবে একটু সাড়া দিন।

আশা করা যায় আপনাকেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর দীন বিজয়ের জন্য নির্বাচিত করবেন।



## এক ক্লিকেই...!

জীবনের সবক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের কথা শুনলে কেউ কেউ বলে উঠেন, ‘আরে আস্তে আস্তে! একসাথে কি সব হয়ে যাবে? এটা কি যন্ত্রের বাটন নাকি যে, ক্লিক করলেই কাজ শেষ?’

বাস্তবতা হচ্ছে, ঈমানী শক্তির বলে মানুষ এমনভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে যে, মনে হবে সত্যি সত্যিই ‘বাটনে ক্লিক’ করে হয়ে গেছে!

ইতোমধ্যে আমরা এর কিছু উদাহরণ দেখিয়েছি:

- উমার রাহিয়াল্লাহু আনহু রেগেমেগে উয়াইনার ওপর চড়াও হয়ে কিছু একটা করতে যাচ্ছেন। এর-ই মধ্যে আয়াত শুনলেন,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

‘(হে নবি) ক্ষমার পথ অবলম্বন করুন, সৎকাজের আদেশ দিন আর জাহিলদের উপেক্ষা করে চলুন।’<sup>[৩৫]</sup>

ব্যস! থেমে গেলেন, ক্ষমা করে দিলেন।

বাটনের এক ক্লিক!

- সাহাবায়ে কেরাম মদ পান করছেন। এরই মধ্যে আয়াত শুনলেন, ‘মদ নিষিদ্ধ।’  
ব্যস! সাথে সাথে মদ ফেলে দিলেন।

বাটনের এক ক্লিক!

[৩৫] সূরা আরাফ, ৭ : ১৯৯।



এবার আরেকটি উদাহরণ। বিষয়টি রাগ দমনের চেয়েও কঠিন, মদ ছেড়ে দেয়ার চেয়েও শক্ত।

আবু বকর রাঃ-এর এক দরিদ্র আত্মীয় ছিল। নাম মিসতাহ ইবনু উসাসা রাঃ। আবু বকর নিজের সম্পদ থেকে তার ভরণপোষণ করতেন।

মুনাফিকরা একবার আবু বকরের কন্যা আন্মাজান আয়িশা রাঃ-এর বিরুদ্ধে মারাত্মক একটা কুৎসা রটায়। তাঁর সতীত্বের ব্যাপারে ছড়ায় জঘন্য অপবাদ। তখন মিসতাহ রাঃ-এর কী করা উচিত ছিল?

নিজের সহানুভূতিশীল-আত্মীয়-কন্যার এমন মুহূর্তে তার পক্ষে থাকা, লোকদেরকে সংযত রাখা; সহানুভূতির বিনিময়ে এটাই তো হতো তার কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয়।

কিন্তু না; মিসতাহ রাঃ ভুল করে পুরো উলটোটা করে বসলেন। অপবাদ রটনাকারীদের সাথে মিলে এগুলো ঘটা করে প্রচার করতে লাগলেন তিনি!

এরপর সাত আসমানের মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ত্বাহিরা-মুত্বাহহারা আয়িশার পবিত্রতা ঘোষণা করে ওহি নাযিল করেন। অপবাদের শাস্তি দেয়া হলো কুৎসা রটনাকারীদের। বলাবাহুল্য, মিসতাহ-ও তাদের মধ্যে ছিলেন।

নিকটাত্মীয়ের এহেন আচরণে হৃদয়ে বড় একটা আঘাত পান আবু বকর রাঃ। বলে উঠলেন, ‘আল্লাহর কসম! মিসতাহ আয়িশার ব্যাপারে যা করল, এরপর আর ওর জন্য আমি কখনো কিছু খরচ করব না!’

এ ধরনের কাজে এমন প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা চাইলেন তাঁর বান্দারা মহান চরিত্রের অধিকারী হোক। তাই আয়াত নাযিল করেন,

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

‘তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন (এমন) শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। তাদের তো (ভুলকারীদের) ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।’<sup>[৩৬]</sup>

এখন আবু বকরের প্রতিক্রিয়া কী হলো?

তিনি বলে উঠলেন, ‘হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই চাই, আল্লাহ যেন আমাকে ক্ষমা করেন।’ তারপর তিনি পুনরায় মিসতাহ’র জন্য খরচ করতে লাগলেন এবং বললেন, ‘আল্লাহর কসম! আমি কক্ষনো ওর জন্য খরচ করা বন্ধ করব না!’<sup>[৩৭]</sup>

‘বাটনের একটা ক্লিকে’র মতো না বিষয়টা? এক ক্লিকে পুরো ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলা!

‘আল্লাহর কসম! আমি মিসতাহ’র জন্য আর কখনো কিছু খরচ করব না’ থেকে  
‘আল্লাহর কসম! আমি কখনো খরচ করা বন্ধ করব না!’

এই ঘটনার পর্যালোচনায় ইবনু কাসীর  বলেন,

‘‘এই (বৈশিষ্ট্যের) কারণেই (আবু বকর) ‘সিদ্দীক’ হয়েছেন।’’<sup>[৩৮]</sup>

আল্লাহর আদেশে সাড়া দিয়ে ক্ষমা করার কারণে কি মুসলিমদের কাছে আবু বকরের ভক্তি-শ্রদ্ধা কমে গেছে?

অবশ্যই না! বরং কিয়ামাত পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষ তাঁকে ভালোবাসবে, শ্রদ্ধা করবে। তাঁর নাম উচ্চারণ করলেই বলবে, ‘রদিয়াল্লাহু আনহু।’

ভাই ও বোন আমার! যখন আপনাকে বলা হবে,

‘যে আপনাকে কষ্ট দিয়েছিল, যে বন্ধুকে তার খারাপ আচরণের জন্য পরিত্যাগ করেছিলেন, দিন না ক্ষমা করে।’

তখন কি আপনি বলবেন, ‘না, না, সে আমাকে যে কষ্ট দিয়েছে সেটা কখনোই ভোলা সম্ভব নয়?’

না বন্ধু, আপনার কষ্ট আবু বকরের ওই যাতনার চেয়ে বেশি নয়!

এই আয়াতটি স্মরণ রাখুন

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

‘তাদের তো (ভুলকারীদের) ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।’<sup>[৩৯]</sup>

[৩৭] পুরো ঘটনা জানতে: বুখারি, ৪৭৫০; মিসতাহ ইবনু উসাসা -এর ঘটনাটি সংক্ষেপে রয়েছে: বুখারি, ৬৬৭৯।

[৩৮] তাফসীরু ইবনি কাসীর, ৬/২৯।

[৩৯] সূরা নূর, ২৪ : ২২।



## নাক কাটলে কাটুক

আল্লাহর আদেশের সামনে সাহায্যে কেরামের শর্তহীন আনুগত্যের আরেকটি উদাহরণ:

ইমাম বুখারি رحمہ اللہ বর্ণনা করেন, ‘মাকিল ইবনু ইয়াসার رحمہ اللہ তার বোনকে এক লোকের কাছে বিয়ে দিলেন। কিছুকাল পর স্বামী তাকে তালাক দেয়। কিন্তু ইদত শেষে নতুন করে আবার বিয়ের প্রস্তাব দিলো সে।’

একটু ভাবুন তো- মা’কিল ইবনু ইয়াসারের অনুভূতি তখন কেমন ছিল?

এই লোকটার কাছে তিনি নিজের বোনকে বিয়ে দিলেন, মানুষকে নিমজ্ঞণ করে খাওয়ালেন, কতসব আয়োজন করলেন। তারপর সে কী করল? তালাক দিয়ে দিলো! দিলো তো দিলো, একদিন গেল দুইদিন গেল। এমন করে সপ্তাহ আর মাস পেরিয়ে কেটে গেল তিন তিনটা মাস। এর মধ্যেও ফিরিয়ে নিল না সে। লোকটার কারণে মা’কিল ও তার বোন এই কয়মাস কতটা কষ্ট পেয়েছেন। কতটা বিষণ্ণতায় সময় পার করেছেন। আর সে-ই কি না আবার এসেছে প্রস্তাব নিয়ে!<sup>[৪০]</sup>

তখন মা’কিল ইবনু ইয়াসারের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল?

তিনি বললেন, ‘আমি বোনকে আপনার শয্যাসঙ্গী বানালাম, আপনাকে মান-মর্যাদা দিলাম, এরপরও আপনি তাকে তালাক দিলেন! এখন আবার এসেছেন প্রস্তাব নিয়ে? না, না! আল্লাহর কসম! সে আর কক্ষনো আপনার কাছে ফিরে যাবে না।’

এমন প্রতিক্রিয়া আসাই স্বাভাবিক।

[৪০] রজঈ তালাকে ইদতের মধ্যে ফিরিয়ে না নিলে নতুন করে বিয়ে করতে হয়। তবে তিন তালাক দিয়ে বসলে এভাবে সরাসরি ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকে না।



কিন্তু ওই তালাক-দেয়া লোকটির মধ্যে এমনিতে কোনো সমস্যা ছিল না। মেয়েটিও মনে মনে ফিরে যেতে চাইছিল তার কাছে। দয়াময় আল্লাহ তাদের উভয়ের পরস্পরের প্রতি প্রয়োজনের বিষয়টি বুঝলেন। তাই আয়াত নাখিল করে দিলেন,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آيَاتُ  
لَكُمْ وَأُظْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿১৩২﴾

‘আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তারপর তারাও নির্ধারিত ইদত পূর্ণ করতে থাকে, তখন তাদের পূর্ব স্বামীদের সাথে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিয়মানুযায়ী বিয়ে করতে বাধা দিয়ো না। এ উপদেশ তাকেই দেয়া হচ্ছে, যে আল্লাহ ও কিয়ামাত দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে একান্ত পরিশুদ্ধি ও সর্বোত্তম পবিত্রতা। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।’<sup>[৪১]</sup>

এই আয়াত শোনার পর মি’কালের মনোভাব পালটে যায়। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, আমি তা-ই করব।’<sup>[৪২]</sup>

আরেক বর্ণনায় বর্ণনাকারী বলেন, ‘তিনি অহমিকা পরিত্যাগ করে আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করেন।’<sup>[৪৩]</sup>

হ্যাঁ, এটাই শর্তহীন, পূর্ণ আনুগত্য। এরপর বোনকে ওই ব্যক্তির সাথে পুনরায় বিয়ে দেন তিনি।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, মা’কিল ইবনু ইয়াসার বললেন, ‘আল্লাহর আদেশের জন্য আমার নাক ধুলোয় ধূসরিত হলেও আমি আল্লাহর আদেশ-ই বাস্তবায়ন করব।’<sup>[৪৪]</sup>

নাক ধুলোয় ধূসরিত হওয়া বলতে চরম লাঞ্ছনা বোঝায়। বাংলা ভাষায় যেমন বলা হয়, ‘নাক কাটা যাওয়া।’

ধরুন, এখনকার সময় আমাদের কারও সাথে এরকম কিছু ঘটল। কারও মেয়ের জামাই তালাক দেয়ার পর এখন আবার বিয়ে করতে চাচ্ছে। অথবা তালাকও হয়নি। একটু ঝগড়া-ঝাটির কারণে মেয়েকে বাসায় দিয়ে গেছে শুধু। এখন কয়েকমাস পর জামাই নিতে এসেছে। তখন অবস্থাটা কী হয়?

[৪১] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৩২।

[৪২] বুখারি, ৫১৩০।

[৪৩] বুখারি, ৫৩৩১।

[৪৪] তাফসীরুর রাযী, ৬/৪৫৪, উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়।

‘অসম্ভব! আমার মেয়েকে আর তোমার মতো ছেলের কাছে দিচ্ছি না। এই আমার শেষ কথা। দুনিয়া একদিকে আমার কথা একদিকে।’

এর সাথে তুলনা করুন সাহাবির কথাটি। যেন বলছেন, ‘আমার ইয়্যাত-সম্মান-প্রেস্টিজ সব একদিকে আর আমার আল্লাহর আদেশ একদিকে।’

একটু মেলান নিজেকে! তাদের মতো হতে না পারলেও এই মর্যাদাবান মহামনীষীদের মতো হওয়ার চেষ্টা করাও বা কম কীসে! তাদের অনুকরণ করাও তো সফলতা।

## দারুণ অফার

জীর্ণ-কুটিরে, ধূলিমাখা চাটাইয়ে বসা দু-জাহানের বাদশাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দরবারে হাজির সাহাবি আব্দ দাহদাহ রাঃ। আয়াত নাযিল হলো,

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٤﴾

‘এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম (শর্তে) ঋণ দেবে; অতঃপর আল্লাহ তা দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন?’<sup>[৪৫]</sup>

এই আয়াতের উদ্দেশ্য কী?

এখানে আল্লাহ তাআলা বোঝাতে চেষ্টা করেন, আমরা যেন তার রাস্তায় ব্যয় করি। তা হলে ঐ দিন কিয়ামাতের দিন তা ফেরত দেবেন। ঠিক যেভাবে কেউ ঋণ নিয়ে তারপর ফেরত দেয়। তবে লেনদেন যেহেতু রব্বুল আলামীনের সাথে, তাই একটু আলাদা ব্যাপার-সাপার তো বটেই!

তিনি ফেরত দেবেন দ্বিগুণ-তিনগুণ আর বহুগুণ বৃদ্ধি করে!

সাহাবি আব্দ দাহদাহ রাঃ এই আয়াত শুনে বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ নিজে আমাদের কাছে ঋণ চাচ্ছেন?’ রাসূলুল্লাহ সঃ বললেন, ‘হ্যাঁ, আব্দ দাহদাহ!’

দান-সাদাকাহ’র প্রতি রবের এই অনুপ্রেরণায় আব্দ দাহদাহ রাঃ কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন দেখুন-

তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বললেন, ‘দেখি, আপনার হাতটা..।’ কোনো বিষয়ে চুক্তি

[৪৫] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৪৫।



করার সময় এ রকম হাত ধরার রীতি ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত দিলেন। এরপর আব্দ দাহদাহ ﷺ বললেন, ‘আমার বাগানটি আমি আমার রবকে ঋণ দিলাম।’ উল্লেখ্য, তার বাগানে ছয়শ খেজুর গাছ ছিল। অর্থাৎ, কম করে হলেও তিন একর জমির ওপর তৈরি বাগান! তাও আবার মদীনা মুনাওয়ারায়। সে-সময় এটা কতটা মূল্যবান ছিল, তা সহজেই অনুমেয়!

আব্দ দাহদাহ ﷺ এত দামী জিনিস আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে দিলেন; কেন? শুধুমাত্র একটি আয়াত শুনে:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

‘এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম (শর্তে) ঋণ দেবে?’

এরপর তিনি বাগানে গেলেন। তার স্ত্রী-সন্তানরা ছিল সেখানে। গিয়ে স্ত্রীকে ডাকলেন,

- উম্মু দাহদাহ!

- জি, বলুন।

- বাগান থেকে বের হয়ে যাও, ‘أَقْرَضْتُهُ رَيِّ’ এটা আমার রবকে ঋণ দিয়েছি।<sup>[৪৬]</sup>

মাত্র একটি কথা-ই আব্দ দাহদাহ ﷺ-এর স্ত্রী-সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হলো। একটি বাক্যই তারা প্রস্তুত হয়ে গেলেন নিজেদের বাগান, সেখানে কাটানো সুন্দর মুহূর্তগুলো কুরবানি দিতে। ওই একটি বাক্যই: ‘أَقْرَضْتُهُ رَيِّ’

- ‘এটা আমার রবকে ঋণ দিয়েছি।’

কারণ, এ কথার মর্মার্থ তারা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন!

ধরুন, আপনি ঢাকার নাগরিক। কামরাঙ্গীরচরে আপনার সাধারণ একটা ঘর আছে। কেউ প্রস্তাব দিলো, ‘ভাই, আপনি এটা ছেড়ে দিন। আগামী বছর এর পরিবর্তে আপনাকে গুলশানে বিশাল একটি বিল্ডিং দেয়া হবে!’ কেমন লাগবে তখন?

হ্যাঁ বন্ধু, আব্দ দাহদাহ ﷺ ও তাঁর পরিবারের কাছে জান্নাতের সেই অফার ছিল অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আর সময়ের কথা কী বলব! এই নশ্বর দুনিয়া তাদের কাছে আমাদের হিসেবের এক বছরের চেয়ে বেশি ছিল না!

তা ছাড়া তাঁরা তাঁদের বাগান ছেড়ে দিয়েছিলেন এমন এক জান্নাতের বিনিময়ে, ‘যেখানে একটি চাবুক রাখার জায়গার মূল্য পৃথিবী ও পৃথিবীর মাঝে যা কিছু আছে

[৪৬] মুসনাদু আবি ইয়া'লা, ৪৯৮৬; মুসনাদু বাযযার, ২০৩৩, ইবনু হাজার আসকালানি ﷺ এই হাদীসটিকে যঈফ বলেছেন; মাতালিবুল আলিয়াহ, ৪০৪৬।

তা থেকেও বেশি।<sup>[৪৭]</sup>

চিন্তা করে দেখেছেন? একটা চাবুক রাখতে আর কতটুকু জায়গা লাগে? বড়জোর কয়েক বর্গ সেন্টিমিটার। এতটুকুর দাম দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে বেশি!

এ ছাড়াও এটাই তো যথেষ্ট যে, সেই জ্ঞানাত চিরস্থায়ী আর এই পৃথিবী ধ্বংসশীল।

একই চিত্র আবু তালহা আনসারী রাঃ-এর জীবনে। যখন এই আয়াত নাযিল হলো,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

‘প্রিয় বন্ধু থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কক্ষনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না।’<sup>[৪৮]</sup>

আবু তালহা বললেন, ‘এ তো মহাসুযোগ। আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলা স্বয়ং আমার কাছে কিছু চাচ্ছেন! হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে স্বাক্ষরী রেখে আমার ‘বায়রাহা’ নামক বাগানটি আল্লাহর জন্য দান করলাম। রাসূলুল্লাহ সঃ শুনে বললেন, এ বাগান তোমার দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দাও।’<sup>[৪৯]</sup>

অতএব ভাই ও বোন আমার, যখনই এ ধরনের দানের কোনো আয়াত পড়বেন, কম হলেও কিছু না কিছু দান করার চেষ্টা করবেন। আল্লাহর কিতাবের ডাকে প্রাণবন্ত-হৃদয়ে সাড়া দেয়ার স্বরূপ এমনই হওয়া চাই।

বাসায় একটা বক্স রাখতে পারেন। যখনই কোনো দানের আয়াত পড়বেন, সাদাকাহর নিয়তে সেখানে অল্প অল্প টাকা রাখবেন। একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর বের করবেন সেটা। এতে কী হবে? সাথে-সাথেই তো আর দান করার মতো কাউকে পেয়ে যাবেন না। কিন্তু বক্সে রাখা মানে দানের নিয়ত করা। ফলে আয়াত পড়ার সাথেসাথে আমল করলে যে রকম সাওয়াব হতো, তাও পেয়ে গেলেন। আর জানেন-ই তো, আল্লাহ তাআলা আখিরাতে একে বৃদ্ধি করে দেবেন দ্বিগুণ-তিনগুণ নয়; বহু-বহুগুণ!



## বোনের তরে নিবেদন

এখন পর্যন্ত উল্লিখিত সাহাবিদের ঘটনাগুলোতে সবাই ছিলেন পুরুষ। এখন আমরা নারী সাহাবিদের অনুরূপ একটি নমুনা পেশ করব। হ্যাঁ, সেইসব মহিয়সী নারীদের কথা বলব, যাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে আমাদের বর্তমান সময়ের বোনেরা। বৃদ্ধি পাবে তাদের ঈমানী শক্তি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

‘(হে নবি) ঈমানদার নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং যৌনাস্থের হিফায়ত করে। যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া কোনো সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে। আর মাথার ‘খিমার’ (ওড়না) যেন ‘জাইব’-এর ওপর (বক্ষদেশে) ফেলে রাখে।’<sup>[৫০]</sup>

এই আয়াত নাযিলের পূর্বে নারীরা ‘জাইব’ নামের একরকম পোশাক পরিধান করতো। চুল, ঘাড় ও বুকের কিয়দাংশ বেরিয়ে থাকতো এতে।

আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে এগুলো সব (চুল, ঘাড়, পুরো বুক) ‘খিমার’ তথা ওড়না দিয়ে ঢেকে ফেলার নির্দেশ দেন।

শাব্দিক অর্থে খিমার বলা হয় মাথা ঢাকার কাপড়কে। এটা চেহারা ঢাকার নিকাব থেকে একটু আলাদা।

[৫০] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।



তো, আয়াতে মুসলিম নারীদের বলা হলো, তারা তাদের মাথা, ঘাড় ও বুক ঢেকে রাখবে। আপাতত চেহারা ঢাকা বা না ঢাকার মতবিरोধে যাচ্ছি না।

তো, এই আয়াত নাযিলের পর মুসলিম নারীদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? আপনার কী মনে হয়?

তারা কি বলেছিলেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আবহাওয়া তো খুব গরম! বিশেষ করে মদীনার আবহাওয়ার যে অবস্থা...?’

তারা কি বলেছিলেন, ‘দর্জি আগে হিজাব তৈরি করে নিক! ততদিন অপেক্ষা করি...?’

না। আল্লাহর আদেশ তাদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তা বুখারির হাদীসে দেখুন,

আয়িশা রা বলতেন, ‘এই আয়াত নাযিলের পর মুসলিম নারীরা (গায়ে থাকা) কাপড়ের পার্শ্ব ছিড়ে ঘোমটা দিতে শুরু করে...।’<sup>[৫১]</sup>

ধরুন, কোনো মহিলা তার বোনের ঘরে বা মায়ের কাছে বসে আছেন। কিংবা বাজারে কেনাকাটা করছেন। এমন সময় শুনলেন এই আয়াতটি। শোনা মাত্রই তিনি গায়ের লম্বা কাপড়ের পার্শ্ব থেকে ছিড়ে আল্লাহ তাআলা যা আবৃত করতে বলেছেন, তা আবৃত করে নিলেন!

কেন এরকম করলেন?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আনুগত্যের কারণে, তাঁকে ভালোবেসে, তাঁর প্রতিদানের প্রত্যাশায়, তাঁর শাস্তিকে ভয় করে!

প্রিয় মুসলিম বোন আমার!

وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ

‘... যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া কোনো সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে। আর মাথার ওড়না যেন বক্ষদেশে ফেলে রাখে। তাদের স্বামী, পিতা, স্বশুর, পুত্র... ব্যতীত কারোও কাছে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।’<sup>[৫২]</sup>

এই আয়াত পড়ার সময় আপনার অনুভূতি কেমন হয়?

এখানে ১২ ধরনের আত্মীয়ের কথা বলা হয়েছে, যারা ব্যতীত অন্য কারও সাথে বিনা

[৫১] বুখারি, ৪৭৫৯।

[৫২] সূরা নূর, ২৪ : ৩১।

প্রয়োজনে ও পর্দা ছাড়া সাক্ষাৎ করা নিষিদ্ধ।

বোন, আপনি কতবার এই আয়াত পড়লেন; রমাদানে, রমাদানের বাইরে...। তারপরও কীভাবে আপনার প্রিয় খালিকের বিধানের বিপরীত করছেন, তার আদেশের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছেন?

যেন আপনি আল্লাহর কথার জবাব এভাবে দিচ্ছেন যে, ‘না, ইয়া রব, পারব না! সৌন্দর্য ঢেকে রাখব কেন? বাড়ির দারোয়ান থেকে শুরু করে ভার্টিটির ফ্রেন্ড, অফিসের কলিগ, দোকানদার, গাড়ির পাশের সিটের লোক, পথচারী-সবাই-সবাইকে দেখাব আমার রূপ-লাবণ্য।’ যেন আল্লাহর আদেশ আপনার কাছে গুরুত্বহীন ও ঐচ্ছিক!

এরপরও কি মনে করেন যে, আপনি কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হবেন? আপনার ঈমান বৃদ্ধি পাবে? আপনি তো কুরআনের মিষ্টতা আর ঈমানের স্বাদ নেয়াকে উপেক্ষা করে নিজের প্রবৃত্তির ডাকে সাড়া দিচ্ছে!

أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ

‘তোমরা কি উত্তম জিনিসের বিনিময়ে নিকৃষ্ট জিনিস চাও?’<sup>[৫৩]</sup>

প্রিয় বোন আমার! দেখুন, আলোচ্য পর্দা বিষয়ক আয়াতের শেষ দিকে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা কী বলছেন। দেখুন না! আপনার রব আপনাকে ডাকছেন:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘আর হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে ফিরে এসো (তাওবা করো), তবেই সফলকাম হবে।’<sup>[৫৪]</sup>

[৫৩] সূরা বাকারাহ, ২ : ৬১।

[৫৪] মরায়ুন নর, ১৪ : ৩১।



## মজবুত শেকড়

বিগত আলোচনাগুলোতে আমরা দেখলাম, আল্লাহর আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম কীভাবে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতেন। একদম ইলেকট্রিক বাটনের মতো। ক্লিক করলেই স্টার্ট!

তা হলে যে ধৈর্য, অধ্যবসায়, ও সাধনা নিয়ে এত প্রবাদবাক্য আর নীতিকথা শোনা যায়, সবই কি ভুল?

না। সময় নিতে হবে ঠিক, সাধনাও করতে হবে। তবে ব্যাপারটা এমন নয় যে, প্রত্যেকটি কাজের জন্য আলাদা আলাদা করে সময় নিতে হবে, আলাদাভাবে অভ্যাস করতে হবে। সাহাবাদের জীবনে এমনটা দেখতে পাই না আমরা। তবে হ্যাঁ, সাধনা হবে অন্তরে ঈমানের ভিত্তি মজবুত করার জন্য, আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্কের বিষয়টি উপলব্ধি করার জন্য। কারণ, অন্তরে ঈমানের ভিত মজবুত হয়ে গেলে বাহ্যিক আমলের আগ্রহ-উদ্যম এমনিতেই তৈরি হয়ে যাবে। রাসূল ﷺ বলেছেন,

ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব (প্রতিপালক) হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট, সে ঈমানের (প্রকৃত) স্বাদ লাভ করেছে।’<sup>[৫৫]</sup>

এই স্বাদ পাওয়ার ফলেই মুমিন হয়ে যায় সদাপ্রস্তুত সৈনিকের মতো। সেনাপতির আদেশ পেলেই জীবন বাজি রেখে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত।

সাহাবিদের জীবন থেকে যে নমুনাগুলো আমরা দেখলাম, এগুলোও অন্তরের ওই



ঈমানী শক্তির কারণেই। তাদের প্রবাদতুল্য ঘটনাগুলো যদি জীবনবৃক্ষের সুমিষ্ট ফল হয়, তবে সেই বৃক্ষের পুষ্টির উৎস হচ্ছে অন্তরের গভীরে প্রোথিত শেকড়। যার নাম ‘ঈমান’।

মোটকথা, তাদের আমলের স্পৃহা ও উদ্দীপনার উৎস হচ্ছে অন্তরের ঈমানী মজবুতি ও দৃঢ়তা। আর এই দৃঢ়তা অর্জনের জন্য সুদীর্ঘ সাধনা আবশ্যিক। অবতীর্ণ আয়াতের বিষয়বস্তুর ক্রম দেখলেই এই বাস্তবতা বোঝা যায়।

প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়েছে জালাত ও জাহান্নামের আলোচনাসম্বলিত মুফাস্সাল সূরাগুলো। তারপর যখন মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল, তখন হালাল-হারামের বিধান সম্বলিত সূরা অবতীর্ণ হওয়া শুরু করে। যদি প্রথমেই ‘মদ পান কোরো না’, ‘ব্যভিচার কোরো না’ এরকম আদেশ নাযিল হতো, তাহলে মানুষ জেদ করে বলতো, ‘মানি না! মানব না!’ ফলে আমরাও পেতাম না এ পর্যন্ত উল্লেখিত চমৎকার ঘটনাগুলো।

তার মানে আল্লাহ তাআলা প্রথমে তাঁর বান্দাদের অন্তরকে সুস্থ ও সুন্দর করে গঠন করেছেন। দিয়েছেন জালাতের আশা, দেখিয়েছেন জাহান্নামের ভয়। এরপর যখন তাদের হৃদয়ে দৃঢ়-বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেল, তখন আল্লাহর আদেশের একনিষ্ঠ আনুগত্য করা আর কঠিন হয়নি তাদের জন্য। কিতাবুল্লাহর আয়াত শোনামাত্রই তারা ‘লাব্বাইক’ বলতে পেরেছেন। নিজেদের রীতিনীতি আর অভ্যাসকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন করতে পেরেছেন খুব সহজেই।

তাই আপনিও যদি চান এরকম শর্তহীন আনুগত্য করতে, তবে শেকড় মজবুত করুন। শক্তিশালী করুন ঈমানের ভিত। তাঁদের মতো ঈমান তৈরি করার চেষ্টা করুন,

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ  
وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

﴿১০১﴾

‘যারা অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার এবং যারা কল্যাণকর্মে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও সন্তুষ্ট তাঁর প্রতি। তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করেছেন এমনসব স্বর্গোদ্যান, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে বয়ে চলে ঝরনারাজি; সেখানে তারা থাকবে চিরকাল, আর এটাই মহাসাফল্য।’[১০১]

## উত্তম বিকল্প

মক্কায় উল্লেখযোগ্য কোনো ফসল উৎপন্ন হতো না। সেখানকার অর্থনীতি ছিল ব্যবসা-নির্ভর। আর তখনকার সময় আরবে আজকের মতো পেট্রোল ছিল না।

মুসলিমরা মক্কা বিজয় করার পরও আরব উপদ্বীপে বহু লোক ছিল মুশরিক। যেহেতু বাইতুল্লাহ তাদের কাছেও সম্মানিত, তাই তারাও মক্কায় আসতো হাজ্জের মৌসুমে। মুসলিমরা তাদের সাথে ব্যবসায়িক কায়-কারবার করতো, বিভিন্ন পণ্য বেচাকেনা করতো।

হ্যাঁ আল্লাহ তাআলা মক্কার অর্থনীতির একমাত্র ভিত্তি বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। বললেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَأُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

‘হে ঈমানদারগণ, মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং, এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে...।’<sup>[৫৭]</sup>

তো, মাসজিদুল হারামে না আসতে পারলে তারা আর মক্কায় আসবে কোন দুঃখে? অতএব ব্যবসা-বাণিজ্য সব শেষ। মক্কার অর্থনীতি ধ্বংস! দুনিয়ার সমীকরণ তো এটাই বলে, তাই না?

কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর বান্দাদের রহমতের আশ্বাস দিয়ে প্রশান্ত করলেন,

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

‘আর যদি তোমরা দরিদ্রতার আশংকা করো, তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ যদি

[৫৭] সূরা তাওবা, ৯ : ২৮।



চান, নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।’<sup>[৫৮]</sup>

‘যদি তিনি চান’ অর্থাৎ, বিষয়টা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন। তিনি অভাবমুক্ত করতে চাইলে করবেন। বান্দাদের কাজ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ পালন করা, নিঃশর্তভাবে। বান্দা এই শর্ত আরোপ করতে পারবে না যে,

‘আগে আল্লাহ তাআলা বিস্তারিত বলুক, কীভাবে তিনি এই লোকসানের ঘাটতি পূরণ করবেন। তারপর তাঁর আদেশ পালন করব আমরা।’

বান্দা আদেশ পালন করবে, ব্যস! এরপর আল্লাহ চাইলে অভাব পূরণ করবেন। বান্দার কাজ মাবুদের ডাকে সাড়া দেয়া। ফলাফল কী হবে না হবে, সেটা মাবুদই ভালো বুঝবেন!

সাহাবায়ে কেরাম কোনো প্রশ্ন করেননি। আল্লাহর আদেশ, আর কোনো কথা নেই। আমার অর্থনৈতিক ক্ষতি হলেও আদেশ মানতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম করলেনও তা-ই।

কিন্তু পরের আয়াতেই চলে এলো উত্তম বিকল্প। আল্লাহ তাআলা উল্লিখিত আয়াতের পরের আয়াত নাযিল করে মুসলিমদের জন্য জিযিয়াকে হালাল করে দেন। পুরো আরব উপদ্বীপকে করে দেন মুসলিমদের শাসনাধীন।

এটা উভয়পক্ষের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। বিজিত এলাকার লোকেরা ইসলামি শাসনে ন্যায়-ইনসাফের ছায়ায় আশ্রয় পেল। মুক্তি পেল মানুষের তৈরি করা বাতিল দ্বীনের অন্যায়-অত্যাচার থেকে। অপরদিকে মুসলিমরাও ফিরে পেল হারানো ব্যবসা-বাণিজ্যের বিনিময়ে আরও উত্তম জিনিস।

প্রিয় ভাই ও বোন আমার!

আমরা যদি আল্লাহর হিকমাহ ও রহমতের ওপর ভরসা করে তাঁর ডাকে সাড়া দিতে পারি, তবে তিনি কখনোই আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না। কুরআনের এই আয়াতগুলো শুধু কোনো স্থান-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধ নয়। বরং এগুলো চিরন্তন সত্য, সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য।

তাই, লোভনীয় কিন্তু হারাম কোনো চাকরির প্রস্তাব পেলে ওই মরুময় মক্কাবাসীর কথা স্মরণ করবেন। চিন্তা করবেন, কীভাবে কোনোরূপ উৎস-উপকরণ ছাড়াই তাদের রিয়কের ব্যবস্থা করেছিলেন আল্লাহ তাআলা। সেই আল্লাহ আপনার-আমার রিয়কের ব্যবস্থা করতেও সক্ষম। তিনি তো ঈমানের একটু পরীক্ষা নিচ্ছেন মাত্র!

[৫৮] সূরা তাওবা, ৯ : ২৮।



وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

‘আর যদি তোমরা দরিদ্রতার আশংকা করো, তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ যদি চান, নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়।’

## বৃদ্ধ মুজাহিদ

পূর্ণ বিনয় সহকারে শর্তহীন দাসত্ব আর একনিষ্ঠ আনুগত্যকে বলা হয় ‘ইবাদাত’।  
খেয়ালীপূর্ণ-ঐচ্ছিক আনুগত্যের নাম ইবাদাত নয়।

অনেক সময় দেখা যায় কোনো যুবককে যদি প্রশ্ন করা হয়, ‘সালাত আদায় করেছ?’  
সে বলে উঠে, ‘আরে, ভাল্লাগছে না এখন!’

মানে সে আল্লাহর আনুগত্য করে নিজের মন-মেজাজের ওপর ভিত্তি করে। মন ভালো  
থাকলে করে, খারাপ থাকলে করে না। এই মেজাজনির্ভর আনুগত্যকে আর যাহোক,  
ইবাদাত বলা যায় না।

নবিজি ﷺ আনসার সাহাবিদের যেসব বিষয়ের ওপর বাইয়াত করিয়েছিলেন তার  
মধ্যে এ-ও ছিল-

تَبَايَعُونِي عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ

‘তোমরা এ মর্মে বাইয়াত করো যে, তোমরা উদ্যমী অবস্থায়, উদ্যমহীনতায়  
(সর্বাবস্থায়) আমার কথা শুনবে ও আমার আনুগত্য করবে।’<sup>[৫৯]</sup>

মন প্রফুল্ল থাকলে নফলও আদায় করবেন আর অলস লাগলে ফরযও ছেড়ে  
দেবেন—এ হতে পারে না। শারীয়াহর ন্যূনতম ফরয-ওয়াজিবগুলো সর্বাবস্থায়ই আদায়  
করতে হবে। কারণ অলসতা, উদ্যমহীনতা, স্বাভাবিক দুর্বলতা, এগুলো আল্লাহর  
আনুগত্য থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোনো অজুহাত নয়।

এই বিষয়টি খুব ভালোভাবে অনুধাবন করেছিলেন নবিজির সাহাবি আবু তালহা



ﷺ। ঘটনাটি উসমান (রাঃ)-এর শাসনামলের, যখন আবু তালহা'র বয়স সত্তরেরও বেশি। একদিন সূরা তাওবা তিলাওয়াত করছিলেন তিনি। পড়তে পড়তে এই আয়াতে পৌঁছলেন-

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

‘হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায়-ই আল্লাহর রাস্তায় বের হও এবং নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করো। এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন করতে পার।’<sup>[৬০]</sup>

আবু তালহা তার ছেলের ডেকে বললেন, ‘দেখছ না আমার রব আমাকে হালকা ও ভারী উভয় অবস্থায় বের হতে বলছেন! এই আয়াত থেকে বুঝলাম, যুবক বা বৃদ্ধ যে অবস্থায়-ই থাকি, জিহাদে বের হতে হবে। তাই বাবারা, তোমরা আমাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে দাও।’

তখন তার ছেলেরা বললেন, ‘আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গে তাঁর ওফাত পর্যন্ত একসাথে যুদ্ধ করেছেন। আবু বকরের সাথেও তা-ই। আর উমারের যুগে তো আমরাও আপনার যুদ্ধের সাথি ছিলাম।’ ছেলেরা ভেবেছিলেন, এত বড় বড় কুরবানির পর এখন বৃদ্ধ বয়সে বাবা তো একটু বিশ্রাম নিতেই পারেন।

কিন্তু আবু তালহা বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। অগত্যা পিতাকে রণাঙ্গনের জন্য প্রস্তুত করে দিলেন তারা।

সেই অভিযানটি ছিল নৌ-অভিযান। আবু তালহা মুজাহিদ্দীন বাহিনীর সাথে জাহাজে আরোহণ করেন। কিন্তু পথেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

জাহাজ তখন মাঝসমুদ্রে। এক সপ্তাহের আগে কোনো উপকূলে পৌঁছা সম্ভব ছিল না যে, তাকে সেখানে দাফন করা হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর হাবীবের এই সাহাবিকে সম্মানিত করতে চাইলেন। বান্দার দেহকে রক্ষা করার ইচ্ছে করলেন তিনি। যেখানে গরম আবহাওয়ার মধ্যে একদিনেই লাশে পচন ধরতে শুরু করে, সেখানে আবু তালহা'র লাশ এক সপ্তাহেও কিছু হয়নি।<sup>[৬১]</sup>

পরিশেষে আমরাও এই ধারণা করি যে, আল্লাহ তাআলা আবু তালহা'র দেহকে যেভাবে দুনিয়াতে রক্ষা করেছেন, তেমনিভাবে আখিরাতেও আযাব থেকে রক্ষা

[৬০] সূরা তাওবা, ৯ : ৪১।

[৬১] সহীহ ইবনু হিব্বান, ৭১৮৪, সহীহ।

করবেন। রদিয়াল্লাহু আনহু।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের দুনিয়াতে সুখী রাখুন এবং শাহাদাতের মৃত্যু নসীব করুন। আমীন।

আমাদের জন্য



## নিশ্চিত গন্তব্যে যাত্রা

মনে করুন, সফরে বের হয়েছেন। গন্তব্য এমন কোনো শহর, যেখানে আপনার কিছু প্রিয় মানুষের বাস। তো আপনার কাছে সেই শহরে পৌঁছার একটা ম্যাপ আছে। এই ধরুন, বর্তমান সময়ের GPS, গুগল ম্যাপ বা এ-জাতীয় কিছু। এখন আপনার যদি আস্থা থাকে যে, ম্যাপটা পুরো ঠিকঠাক আছে; তা হলে কী করবেন?

বিকল্প অন্য কোনো রাস্তার দিকে তাকানোর সময় নেই, সোজা গন্তব্যের দিকে লং ড্রাইভ! যত দ্রুত সম্ভব পৌঁছুতে হবে, প্রিয় মানুষদের সাথে সাক্ষাত করতে হবে। তাই না?

পক্ষান্তরে ধরুন, ম্যাপটার ব্যাপারে তেমন ভরসা পাচ্ছেন না। লোকেশন ঠিক আছে কি না, ঠিকঠাক কাজ করবে কি না, কিছুই নিশ্চিত না। তখন কী করবেন?

অবশ্যই খুব দ্রুত যেতে পারবেন না। কিছুক্ষণ পরপর থামবেন, লোকজনকে জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নেবেন ঠিক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন কি না। আপনার মন গন্তব্যের প্রিয় মানুষদের দিকে স্থির থাকবে না। সবসময় এদিক সেদিক বিক্ষিপ্ত থাকবে। সংশয় আর দৃষ্টিভ্রান্তির মধ্যে থাকবে।

এই উদাহরণের সাথে কুরআনের কী সম্পর্ক? আল্লাহ তাআলা বলছেন,

﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (০৬)

‘আর তোমরা ধৈর্যধারণ করে এবং সালাত আদায় করে আল্লাহর সাহায্য কামনা করো। নিশ্চয়ই এটি (সকলের কাছে) বড় কঠিন, শুধু একনিষ্ঠ (বান্দাগণ) ছাড়া। (আর একনিষ্ঠ হচ্ছে,) যারা ইয়াকীন রাখে যে, নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে, এবং তারা অবশ্যই তাঁর

কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী।<sup>[৬২]</sup>

‘নিশ্চয়ই এটা বড় কঠিন।’ কঠিনই তো! বিপদ-আপদে ধৈর্যধারণ করা কঠিন বটে।

নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকা কঠিন।

গুনাহের কাজ থেকে বিরত থাকা কঠিন।

সালাতে যত্নশীল হওয়া কঠিন।

কিন্তু কার জন্য কঠিন?

যে ব্যক্তি দ্বীনের সত্যতার ব্যাপারে দ্বিধায় আছে। এই পথে আসলেই জান্নাতে যাওয়া সম্ভব কি না এ ব্যাপারে সংশয়ে পড়ে আছে। যখনই সে কোনো গুনাহ পরিত্যাগ করে, শয়তান এসে বলতে থাকে,

‘তুমি জান্নাতের আশায় এটা ছেড়ে দিলে? শেষমেশ জান্নাত বলতে যদি কিছু না থেকে থাকে, তখন কী হবে? তখন তো একূল-সেকূল সবই গেল!’

এজন্য এসব দ্বিধাগ্রস্ত লোকদের কাছে আল্লাহর হুকুম পালন করা কঠিন হয়ে যায়।

কিন্তু যারা আল্লাহ তাআলার একনিষ্ঠ বান্দা, ‘যারা ইয়াক্বীন রাখে যে, নিশ্চয়ই তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছে, এবং তারা অবশ্যই তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তনকারী’, যারা বিশ্বাস করে, রবের কারীম তাদের পাপ-পুণ্যের হিসাব নেবেন, এর বিনিময়ে জান্নাত-জাহান্নাম দেবেন, তাদের কাছে ওসব কঠিন-ফঠিনের কোনো পাত্তা নেই।

যখন তারা নিজেদের গন্তব্যের ব্যাপারে সুনিশ্চিত, আল্লাহর প্রতিদানের ব্যাপারে দ্বিধাহীন; তখন নেককাজ করা আর গুনাহ ছেড়ে দেয়া তাদের জন্য আর এমন কী!

তা হলে প্রিয় ভাই ও বোন, যখনই কোনো নেককাজ আপনার কাছে কঠিন মনে হবে, কোনো গুনাহ ছেড়ে দেয়া কষ্টকর মনে হবে, নিজেকে জিজ্ঞেস করবেন,

‘আমি কি জান্নাতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি? আল্লাহর সেই জান্নাত কি আমি কামনা করি? আল্লাহর আনুগত্যই যে জান্নাতে পৌঁছার একমাত্র পথ—এ ব্যাপারে আমার কোনো সন্দেহ আছে?’

তা হলে কেন আমি গাফলতের দরিয়ায় ডুবে আছি!’

এরপর আপনার ঈমানের সাথে উত্তর মেলান। ঝেড়ে ফেলে দিন সব দ্বিধা-সংশয়। দেহ-মন একাকার করে দিন সেই কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যের পানে। ডানে-বাঁয়ের সব পথ-বিপথ থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে যান সেই মহান রবের রাস্তায়। যেমনটি প্রিয়

[৬২] সূরা বাকারাহ, ২ : ৪৫।



নবি ﷺ বলেছেন,

مَنْ خَافَ أَذْلَجَ، وَمَنْ أَذْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْحَبَّةُ

‘যে লোক ভয় পায়, সে ভোররাতেই যাত্রা শুরু করে। আর ভোররাতেই যে যাত্রা শুরু করে, সে (দ্রুতই) গন্তব্যে পৌঁছতে পারে। জেনে রাখো, আল্লাহর পণ্য খুবই দামী। জেনে রাখো, আল্লাহর পণ্য হলো জান্নাত।’[৬৩]

## লেগে থেকো না, শুধরে যাও

সাহাবিগণের ঈমান-আমলের অনেক দৃষ্টান্ত এ পর্যন্ত আলোচনা করা হলো। এর অর্থ কি এই যে। তাঁরা কখনো কোনো ভুল করেননি? কোনো গুনাহ করেননি?

না, এমনটি নয়। বরং তাঁরাও গুনাহ করে ফেলতেন, কিন্তু তাতে লেগে থাকতেন না। খাঁটি তাওবা করতেন, ফলে গুনাহগুলো মুছে দেয়া হতো তাদের হিসেবের খাতা থেকে। অন্তরেও বাকি থাকতো না এর কোনো চিহ্ন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ

‘বনী আদাম মাত্রই গুনাহগার। আর গুনাহগারদের মধ্যে তাওবাকারীরাই হলো সর্বোত্তম।’<sup>[৬৪]</sup>

এ বিষয়টি নিয়ে আমাদের একটু ভাবা দরকার। কারণ, আমরা সর্বদা আপাদমস্তক গুনাহের মধ্যে ডুবে আছি। আমাদের অন্তরগুলো পঁচে যাচ্ছে একটু একটু করে, অথচ আমরা সেটা অনুভবই করতে পারছি না।

উহুদ যুদ্ধে আচমকা মুশরিকরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। বেড়ে যাচ্ছিল মুসলিমদের নিহতের সংখ্যা। তখন অনেক সাহাবি ময়দান থেকে পিছু হটে গিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে ভুল ছিল কাজটা।

কিন্তু দেখুন, তারা কীভাবে নিজেদের ভুল সংশোধনের জন্য চেষ্টা করতেন। অস্থির হয়ে যেতেন গুনাহ-মারফের জন্য।

উহুদ যুদ্ধের রেশ কাটতে না কাটতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ অবগত হলেন যে, মুশরিকরা

[৬৪] তিরমিযি, ২৪৯৯, হাসান গরীব



আবার চক্রান্ত করছে। এদিকে সাহাবায়ে কেরাম জখমে জর্জরিত, আহত; সামরিকভাবে চরম বিপর্যস্ত। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারও যুদ্ধের ডাক দিলেন। তাঁর মুয়াযযিন ঘোষণা করলেন, ‘হাইয়া আলাল জিহাদ!’

তা শুনে আহত সাহাবিদের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, জানেন?

ইমাম তাবারি رحمہ اللہ বর্ণনা করেন,

বনু আবদিল আশহাল গোত্রের দুই সহোদর ছিলেন। উহুদ যুদ্ধ থেকে আহত হয়ে পলায়ন করে ফিরে এসেছিলেন তারা। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াযযিন আবার জিহাদে বের হওয়ার ঘোষণা দিলেন, তারা একে অপরকে বলতে লাগলেন, ‘রাসূলুল্লাহর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার এই সুযোগ আমরা হাতছাড়া করব!’

এরপর তারা আহত অবস্থায়-ই বের হয়ে গেলেন। যেহেতু তাদের কোনো বাহন ছিল না, তাই সফর করতে হলো পায়ে হেঁটেই। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে একজনের জখম তুলনামূলক কম ছিল। অপর ভাই যখনই ক্লান্ত হয়ে পড়ে যাওয়ার অবস্থা হতো, তিনি তাকে কাঁধে করে পথ চলতেন! এভাবে তারা ‘হামরাউল আসাদ’ পর্যন্ত সফর করলেন। অর্থাৎ প্রায় তেরো কিলোমিটার পথ।

একটু ভাবুন তো, এই আহত-জখমী শরীর নিয়ে এতটা গরম আবহাওয়ায় ১৩ কিলোমিটার পথ সফর করা। তাও আবার পায়ে হেঁটে!

মুসলিমরা হামরাউল আসাদ তিনদিন অবস্থান করে। আর যুদ্ধ করার সাহস দেখাল না মুশরিকরা। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও মুসলিমদের সাথে নিয়ে ফিরে আসলেন মদীনায়া।<sup>[৬৫]</sup>

লক্ষ করুন, সাহাবায়ে কেরামের মানসিকতার মহত্ত্ব কেমন গগণচুম্বী! এটা তাঁদের উহুদ যুদ্ধ থেকে পিছু হটার গুনাহ ধুয়ে-মুছে সাফ করে দেয়।

তাঁদের প্রশংসা করলেন স্বয়ং আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা,

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا  
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٧١﴾ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ  
إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿٢٧٢﴾ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ  
يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿٢٧٣﴾

‘যারা আহত হবার পরও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রতিদান।

[৬৫] তাফসীকৃত তাবারি, ৬/২৪০, ২৪১; বাইহাকি, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ৩/৩১৪, সনদ হাসান গরীব।

যাদের লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মুকাবিলা করার জন্য লোকেরা  
বহু সাজ-সরঞ্জাম সমাবেশ করেছে; তাদের ভয় করো। (এগুলো শোনার পর)  
তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়ে যায় এবং তারা বলতে থাকে, আমাদের  
জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি কতই না চমৎকার সাফল্যদানকারী। অতঃপর  
মুসলিমরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে ফিরে এলো, তাদের কোনো ক্ষতিই হলো  
না। তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হলো। আর আল্লাহ তো মহানুগ্রহের  
মালিক।<sup>[৬৬]</sup>

এজন্য প্রিয় ভাই ও বোন,

আমাদের লক্ষ রাখতে হবে, কোনো গুনাহ করে ফেললে আমরা যেন তাতে স্থবির  
না হয়ে যাই।

আশা করা যায় এতে করে আল্লাহ তাআলা তাঁর করুণায় আমাদের গুনাহের কাফফারা  
আদায়ের সুযোগ দেবেন। সেই সুযোগে মুছে ফেলতে পারব হিসেবের খাতায় জমা-  
হওয়া গুনাহের দাগগুলো।



## এত ভাবা-ভাবির দরকার নাই!

মাকেমধ্যে চিন্তা-ফিকির না করে কাজ করাই উত্তম। কথাটা অদ্ভুত লাগল, তাই না? আল্লাহর কালাম নিয়ে তো চিন্তা-ফিকির করতেই হবে। ভাবতেই হবে এখানে আল্লাহ তাআলা আমাকে কী করতে বলেছেন, কীভাবে করতে বলেছেন ইত্যাদি।

কিন্তু এরপর? আল্লাহর এই হুকুম পালন করব, না কি করব না—এ নিয়েও কি আবার চিন্তাভাবনা করা লাগবে?

না ভাই; এখন আর কোনো ভাবা-ভাবির সুযোগ নেই। এখন তো আপনি জেনে গেছেন যে, এটা আল্লাহর বিধান। এখন মাথায় যে চিন্তা-ফিকির আর হিসাব-নিকাশের পোকা ঘুরছে, সেটা হচ্ছে আপনার নফসে আস্মারা আর জনাব শয়তানের যৌথ কুমন্ত্রণা। উনারা দুজন যৌথ উদ্যোগে আপনাকে আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরাতে চাচ্ছেন। দেখুন, আল্লাহ তাআলা কী বলছেন,

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ

‘শয়তান তোমাদের অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়।’<sup>[৬৭]</sup>

মানে কী এই আয়াতের?

মানে হলো, আপনি যাকাত বা দান সাদাকাহ করতে চাইলে শয়তান ভয় দেখায়, ‘আরে ব্যাটা! তুই তো ফকীর হয়ে যাবি।’ উলটো অশ্লীল কাজ করতে কুমন্ত্রণা দেয় আপনাকে। আর এই অবস্থায় ‘অশ্লীল কাজ’ কোনটা? যাকাত আদায় না করা।

[৬৭] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৬৮।



এখন আয়াতের পরের অংশে আল্লাহ তাআলা বললেন,

وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘আর আল্লাহ; তিনি তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন।  
আল্লাহ মহাদাতা ও সর্বজ্ঞাত।’[৬৮]

অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় দান করলে তিনিও আপনাকে দান করবেন। বরকত দিয়ে দেবেন সম্পদে।

এজন্য যাকাত আদায়, অভাবী ভাইবোনকে সাহায্য করা, মা-কে প্রতি মাসে তার চলার খরচ দেয়া ইত্যাদি বিষয়ে খরচ করার সময় যখন আপনার মাথায় এটা-সেটা চিন্তা-ফিকির ঘুরপাক খাবে, নিশ্চিত বুঝে নেবেন শয়তান কুমন্ত্রণা দিচ্ছে।

‘আরে মিয়া! এত টাকা খরচ করতাছো, বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ আছে না?’

‘এলো দুই হাতে টাকা বিলাইলে তো আপনার ভিক্ষার ঝুলি লইতে বেশি দিন লাগবে না!’

‘হে হে! দাও দাও! কয়দিন পর ভিটাবাড়ি সব বেচা লাগবে!’

এরকম আরও কতকিছু ভাবনায় আসবে। মগজে ভিড়তেই দেয়া যাবে না এসব চিন্তা-ফিকির। কেননা, এগুলো সব ইবলিসের ওয়াসওয়াসা। এ সবকিছুকে সাইডে রেখে অন্তরকে বোঝান,

وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا

‘আর আল্লাহ; তিনি তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন।’

যাকাত আর দান-সাদাকাহর বিষয়টি উদাহরণ মাত্র। আলোচ্য আয়াতটি ধ্রুবক। এখানে অন্য যে-কোনো দ্বীনি কর্তব্য বসালে একই সিদ্ধান্ত মিলবে-

■ কোনো দুর্বল মাযলুম ভাইয়ের আপনার একান্ত সাহায্য প্রয়োজন। প্রয়োজন আপনার একটু সাহসী ভূমিকা। এবার আয়াত মেলান,

‘শয়তান তোমাদের অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ দেয়। আর আল্লাহ; তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের।’

এখানে শয়তান আপনাকে যালিমের অত্যাচারের ভয় দেখাচ্ছে এবং কাপুরুষতার আদেশ দিচ্ছে। আর আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যালিমদের হাত থেকে নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার।

■ পর্দা করতে চান, কিন্তু আশেপাশের লোকজনের প্রতিক্রিয়া নিয়ে ভয় করছেন।  
এখানেও আয়াতের সাথে মিলিয়ে দেখুন,

‘শয়তান তোমাদের অভাব-অনটনের ভয় দেখায় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ  
দেয়। আর আল্লাহ; তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের।’

শয়তান আপনাকে আশেপাশের লোকজনের নিন্দার ভয় দেখাচ্ছে এবং বেপর্দা হওয়ার  
আদেশ করছে। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, এদের পরিবর্তে তিনি নিজে আপনার  
বন্ধু হবেন। এমনকি অনেকে অনুসরণও করবে আপনার এই কাজ।

সকল ক্ষেত্রে সেই অবস্থানই গ্রহণ করবেন, যেটা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন।  
ফলাফলে কী হবে না হবে, সে বিষয়ে চিন্তা করা আপনার দায়িত্ব নয়।

তো, এই হলো আল্লাহর প্রতিশ্রুতি আর বিপরীতে শয়তানের আশ্বাস।

শয়তানের প্রতিশ্রুতির স্বরূপ হলো,

يَعِدُّهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٢١﴾

‘সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয়, আশ্বাস দেয়। বস্তুত শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি  
দেয়, তা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।’<sup>[৬৯]</sup>

পক্ষান্তরে আল্লাহর ওয়াদার বাস্তবতা এমন,

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

‘এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আর আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতির অন্যথা করবেন না।  
কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না।’<sup>[৭০]</sup>

এবার সিদ্ধান্ত আপনার; আপনি কার প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখবেন।

[৬৯] সূরা নিসা, ৪ : ১২০।

[৭০] সূরা রুম, ৩০ : ৬।



## প্রেমহীন আমল, প্রাণহীন দেহ

প্রিয় ভাই ও বোন,

আল্লাহর আনুগত্য করা আর তাঁর হুকুম পালন করাই যথেষ্ট নয়। বরং প্রকৃত আনুগত্য সেটাকেই বলে, যার মধ্যে ভালোবাসা থাকে।

আমাদের নেক-আমল আল্লাহর কাছে কবুল হওয়ার জন্যও এটা শর্ত যে, ইবাদাত করব অন্তর থেকে, ভালোবেসে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রায়ই আমাদের মাথায় থাকে না।

যেমন, যাকাত আদায় করাই যথেষ্ট নয়। দেখতে হবে যে, আপনি আল্লাহর এই আদেশ পালন করে অন্তরে প্রশান্তি অনুভব করেন কি না।

বোরকা পরাই যথেষ্ট নয়। শালীনতাকে ভালোবাসছেন কি না, সেটাও বিবেচ্য।

অনেক সময় আমাদের আচরণ দেখে মনে হয় যেন, নেক-আমল করছি ঠেকায় পড়ে। তখন সেই আমলগুলোর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একরকম কলুষতা থেকে যায়।

এক লোক একবার আমাকে প্রশ্ন করেছিল,

‘এক রংমিল্লীকে বাসা রং করার জন্য টাকা দিয়েছিলাম। কিন্তু সে ব্যাটা জোচ্ছুরি করে টাকা নিয়ে পালিয়েছে। এখন সেই টাকা কি যাকাতের টাকার সাথে হিসেব করতে পারব?’

আল্লাহ্‌ল মুসতান!

দেখুন অবস্থা! এই মানসিকতা নিয়ে তিনি যাকাত আদায় করেন।

আপনি সালাত আদায় করেন, তবে একেবারে শেষ ওয়াক্তে মুরগির মতো কয়েকটা

চোকর মেরে। এটা কি সালাত-কে ভালোবেসে আদায় করা হলো?

আপনি বোরকা পরেন, পর্দার সব শর্তও জানেন। কিন্তু ইনিয়ে-বিনিয়ে শারয়ী পর্দা বাদ দিয়ে নিজের মনমতো পর্দার নামে ফ্যাশন করছেন। আপনার এই আচরণে কি আল্লাহ তাআলার বিধানের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পাচ্ছে?

প্রিয় ভাই ও বোন, অন্তরের এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর সাথে আপনার ইবাদাত কবুল হওয়া-না-হওয়া জড়িত।

প্রমাণ কী?

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

‘তাদের অর্থ-ব্যয় কবুল না হওয়ার কারণ এটাই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী।’<sup>[৭১]</sup>

আলহামদুলিল্লাহ, এই দোষ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আরও আছে,

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٥﴾

‘তারা সালাতে আসলে অলসতা নিয়ে আসে এবং দান করলে সংকীর্ণ মনে দান করে।’<sup>[৭২]</sup>

অর্থাৎ, বাধ্য হয়ে আমল করে; ভালোবেসে বা সাগ্রহে নয়। ইবাদাতের মধ্যে এমন বিতৃষ্ণ থাকলে কবুলিয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যায়।

খেয়াল করুন, আমল করার কিছু স্বাভাবিক কষ্ট-ক্লেশ আছেই। সেটার কথা বলছি না। যেমন, কারও ফজরে ঘুম থেকে উঠতে কষ্ট হয়। এটা ঈমানের ঘাটতি নয়। তার এই কষ্ট করে উঠাটাই বরং ভালোবাসার প্রমাণ। সে রবের আনুগত্য করতে পেরে আনন্দিত। তার সাথে ওই মুসল্লির বিস্তর ফারাক, যে সালাত আদায় করে টিলেমি করে, গা-ছাড়া ভাব নিয়ে।

আবার গরমের দিনে পর্দা করতে কারও কষ্ট হতে পারে। আর মানুষের কটুকথা তো সারা বছরই শুনছে। কিন্তু অন্তরে ঠিকই পর্দাকে ভালোবাসে সে। আল্লাহ তাআলার এই বিধানের হিকমাহ অনুধাবন করার চেষ্টা করে। এই বোনের সাথে ওই নারীর বিস্তর ফারাক, যে পর্দাকে ভাবে বোঝা।

[৭১] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৪।

[৭২] সূরা তাওবা, ৯ : ৫৪।



অতএব ভাই ও বোন আমার, নেক-আমল করার সময় নিজেকে যেন একটা প্রশ্ন করে নিই। আমি কি এ কাজ ভালোবেসে করছি নাকি নিছক না-করলেই-নয় এজন্য করছি?

হৃদয়ের প্রফুল্লতা ও পরিপূর্ণ মনোনিবেশ থাকলেই প্রমাণিত হবে আমাদের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা। আর আল্লাহ না করুন, যদি প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়, তবে অবিলম্বে আত্মার চিকিৎসা জরুরি।

সবশেষে আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যেসব মানুষের আমল কবুল হয় না তাদের মধ্যে কিম্বা এরাও আছে,

وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿٤٥﴾

‘তারা সালাতে আসলে অলসতা নিয়ে আসে এবং দান করলে সংকীর্ণ মনে দান করে।’<sup>[৭৩]</sup>

আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তর সংশোধিত করে দিন। কবুল করে নিন আমাদের আমল।

## কুরআনের ব্যাপারে ভুল উপলব্ধি

কুরআন পড়তে গিয়ে অনেক সময় কোনো কোনো আয়াতের মর্মার্থ আমাদের বুঝে আসে না। শুধু বুঝি না, তা নয়। বরং মাঝেমধ্যে এমন ভুলভাবে বুঝি যে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর নবি ﷺ-দের ব্যাপারে কু-ধারণা তৈরি হয়।

একজন মুসলিমকে অবশ্যই এরকম ধারণার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে। কারণ, তার উচিত ছিল এসব আয়াতের মর্মার্থ আলিমদের থেকে জেনে নেয়া। নিজের অন্তরকে মন্দ ধারণা থেকে মুক্ত রাখা, আকীদা-বিশ্বাস ঠিক রাখা।

কুরআনের কোন বিষয় নিয়ে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে একবার একটা খুতবা দিয়েছিলাম। আলোচনার পর এক পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তি আসলেন আমার কাছে। বললেন, ‘বিষয়টি যেহেতু তুললেন-ই, তা হলে আমিও একটা কথা বলি। কুরআনে লূত ﷺ-এর একটি উক্তি নিয়ে আমার একটু খটকা লেগেছে।’

কী সেটা?

সূরা হিজরের আয়াত। সমকামী লোকদের উদ্দেশ্যে লূত ﷺ বলেছেন,

هُؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

‘তোমাদের যদি (জৈবিক চাহিদা পূরণ) করতেই হয়, তবে এই যে আমার মেয়েরা আছে।’<sup>[৭৪]</sup>

লোকটি ভেবেছেন লূত ﷺ তাদেরকে সমকামিতার বদলে নারীদের সাথে ব্যভিচার করতে বলেছেন, কারণ এটাতে গুনাহ কম।

[৭৪] সূরা হিজর, ১৫ : ৭১।



আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি! কারণ এই লোকটা বছরের পর বছর কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে সন্দেহ-সংশয়ে ভুগছে, অথচ এটার প্রতিকারের জন্য চেষ্টা করল না।

সে আয়াতের এমন এক মর্মার্থ বুঝে বসে আছে, যেটা একজন নবির সাথে কখনোই যায় না। এর মধ্যে সে এর সঠিক অর্থ জিজ্ঞেসও করেনি কাউকে। অবশেষে যখন তার সামনে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হলো, তখন এসে প্রশ্ন করল।

এমনটা কখনোই সমীচীন নয়, বন্ধু! কারণ, অন্তরের রোগের চিকিৎসা তো দেহের রোগের চিকিৎসার চেয়েও জরুরি। দেহের কোনো রোগ তো চিকিৎসা না করে বছরের পর বছর পুষে রাখেন না। তা হলে কুরআনের ভুল উপলব্ধির যে-রোগ আপনার অন্তরে তৈরি হয়েছে, তার চিকিৎসা তো আরও বেশি জরুরি। এই লোক তো শেষমেশ অন্তত জিজ্ঞেস করেছে। বহু লোক তো রোগ নিজের মধ্যে রেখেই কবরে চলে যায়।

এই আয়াতের মর্মার্থ কী তবে?

এখানে ‘আমার মেয়েদের’ দ্বারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে:

এক. তাঁর উম্মাতের মেয়ে। কারণ প্রত্যেক নবি তাঁর উম্মাতের কাছে পিতা সমতুল্য। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ

‘আমি তোমাদের পিতাতুল্য, তোমাদের আমি শিক্ষা দিয়ে থাকি।’<sup>[৭৫]</sup>

এখানে লূত ؑ তাঁর উম্মাতের সমকামী পুরুষদের বলেছেন বিয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক যৌনাচার করতে।

দুই. তাঁর নিজের ঔরসজাত মেয়ে।

এখানেও বিয়ের কথাই বলা হয়েছে; যিনার অনুমতি নয়। অন্য আরেক আয়াত এটাই ইঙ্গিত করে।

قَالَ يَقَوْمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ

‘লূত বললেন, “হে আমার জাতি, এই-যে আমার কন্যারা রয়েছে, এরা তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র।”’

যিনা-ব্যভিচার তো পবিত্র নয়। সমকামিতার বদলে যিনা করা মানে এক অশ্লীলতা ছেড়ে আরেক অশ্লীলতায় লিপ্ত হওয়া। লূত এখানে স্পষ্টতই বিয়ের নির্দেশ দিচ্ছেন। কোনো নবি গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পরামর্শ দিতে পারেন, এটা চিন্তা করাও পাপ।

### সারকথা:

কুরআনের কোনো আয়াত স্বয়ং ইসলামেরই কোনো বিষয়ের বিরুদ্ধে যেতে পারে না। যেমন- নবিগণ যে নিষ্পাপ, তা ইসলামের স্বতঃসিদ্ধ আকীদা। কুরআনে এর বিপরীত কিছু থাকবে না। যদি কোনো আয়াত পড়ে সেরকম মনেও হয়, তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের-ই বুঝতে ভুল হয়েছে।

এভাবে কোনো আয়াত পড়ে মনে খটকা তৈরি হলেই আমাদের উচিত বিষয়টি নিজের মধ্যে পুষে না রেখে দ্রুত সঠিক ব্যাখ্যা জেনে নেয়া।



## রাসূলের নিরাশা

আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা বলেন,

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ  
بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١١﴾

‘এমনকি যখন (নবি ও) রাসূলগণ নিরাশ হয়ে যেতেন এবং তাঁরা এরূপ ধারণা করতে শুরু করতো যে, তাঁদের মিথ্যা বলা হয়েছে; তখন তাঁদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে যায়। অতঃপর আমি যাদের চেয়েছি, তারা উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না।’<sup>[৭৬]</sup>

এই আয়াত থেকে কী বুঝলেন?

আগের পাঠেই আমরা আলোচনা করেছি যে, নবি-রাসূলগণ নিষ্পাপ। তা হলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা মনে করা কি তাদের পক্ষে সম্ভব?

না। বরং ইয়াকীন ও দৃঢ়বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারাই তো জগৎবাসীর জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

তা হলে আয়াতটির মর্মার্থ কী?

ইমাম তাবারি رحمته তাঁর তাফসীরে তাবারি গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মুসলিম ইবনু ইয়াসার رحمته সাঈদ ইবনু যুবাইর رحمته-কে এই আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সাঈদ ব্যাখ্যা দেন যে, প্রথম অংশে রাসূলগণের এবং দ্বিতীয় অংশে তাদের কওমের লোকদের কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন,

‘এমনকি যখন (নবি ও) রাসূলগণ নিরাশ হয়ে যেতেন’ এর অর্থ হলো যখন

রাসূলগণ তাঁদের কওমের লোকদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যেতেন। আর ‘এমনকি তারা একরূপ ধারণা করতে শুরু করতো যে, তাদের মিথ্যা বলা হয়েছে’ এর মানে হচ্ছে, কওমের লোকেরা ধারণা করতে শুরু করল যে, তাদের মিথ্যা বলা হয়েছে। এখানে ‘তারা’ বলতে কওম উদ্দেশ্য, রাসূলগণ নন। মোটকথা, কওমের কাফিররা ধারণা করতে শুরু করে যে, রাসূলগণ যেই আযাবের ভয় দেখিয়েছিলেন, সেটা মিথ্যা। কারণ এত বছর পেরিয়ে গেল, কিছুই তো হলো না। তারা একরূপ ধারণা করার পর আল্লাহ তাআলা রাসূলদের সাহায্যার্থে কাফিরদের ওপর আযাব পাঠাতেন।

মুসলিম ইবনু ইয়াসার এই তাফসীর শুনে সাঈদকে আলিঙ্গন করেন। বলেন, ‘আপনি যেমনি আমার কষ্ট লাঘব করলেন, আল্লাহ তাআলাও আপনার কষ্ট লাঘব করুন।’<sup>[৭৭]</sup>

খেয়াল করুন, একটি আয়াতের ভুল অর্থ বোঝার কারণে অন্তরে যে সংশয় আর সংকীর্ণতা তৈরি হয়েছিল, সেটা দূর করতে পেরে মুসলিম ইবনু ইয়াসার কতটা আনন্দিত হয়েছিলেন।

মুফাসসির দ্বাহহাক সাঈদ ইবনু যুবাইরের এই ব্যাখ্যার পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেন, ‘এটা শিখতে যদি আমাকে ইয়ামানে সফর করতে হতো, তবেও তা কম হতো।’<sup>[৭৮]</sup>

সত্যিই তো! যখন কুরআনের কোনো আয়াতের ব্যাপারে সংশয়-সংকীর্ণতা থাকে, তখন এ ধরনের চমৎকার ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে তো ভালো লাগারই কথা। এর জন্য মাইলকে মাইল সফর করলেই বা ক্ষতি কী!

বর্তমান সময়ে আমাদের জন্য তো আরও সহজ। ইন্টারনেটে নির্ভরযোগ্য কোনো ওয়েবসাইটে অথবা কোনো আলিমের সাথে যোগাযোগ করে কয়েক মিনিটেই যে-কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা জেনে নিতে পারি আমরা। মাইলকে মাইল সফর করারও প্রয়োজন পড়ে না।

তবে যেটা প্রয়োজন তা হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কালাম বোঝার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া। রব্বের কারীমের কিতাবের ক্ষেত্রে অন্তরকে সাফ রাখার বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকা।

আম্মাজান আরিশা ﷺ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, ‘রাসূলগণ ধারণা করছিলেন যে, তাঁদের অনুসারীরা আবার তাঁদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কি না। কারণ, আল্লাহর প্রতিশ্রুত সাহায্য আসতে বিলম্ব হচ্ছিল।’<sup>[৭৯]</sup>

[৭৭] তাফসীরুত তাবারি, ১৩/৩৮৮, সনদ দুর্বল। ইমাম তাবারির নিকট বর্ণনাকারী মুহাম্মা ইবনু ইবরাহীম আমালী সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

[৭৮] প্রাপ্ত।

[৭৯] তাফসীরুত তাবারি, ১৩/৩৯৬, সনদ দুর্বল।

এই অর্থও হতে পারে। আল্লাহ্ আ'লাম। মোটকথা, আয়াতকে এমন অর্থে ব্যাখ্যা করতে হবে, যা আশিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াসসালাম-এর মর্যাদার উপযোগী হয়। আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা আমাদের কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন, আমাদের কুরআনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের কাতারে शामिल করুন। আমীন।



## দুই উদ্ধৃতি

ধরুন, কোনো অমুসলিম আপনাকে প্রশ্ন করল, ‘ইসলাম আসলে কী?’

আপনাকে সংক্ষেপে পূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবোধক একটি উত্তর দিতে হবে। কীভাবে? কুরআন-সুন্নাহ থেকে দুটি উদ্ধৃতি শোনাতে পারেন তাকে। এ দুটি উদ্ধৃতিই তার কাছে ইসলামকে সংজ্ঞায়িত করে দেবে।

সুন্নাহ থেকে যে উদ্ধৃতিটি দেবেন, তা হচ্ছে নবীজি ﷺ-এর বিদায় হাজ্জের ভাষণ। সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম-এ বর্ণিত আছে এটি।

ব্রিটিশ সাংবাদিক ইভন রিডলী বেশ কয়েক বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, ‘ইসলামের যে সকল মৌলিক বিষয় আপনার জানা প্রয়োজন, তা বিদায় হাজ্জের ভাষণের মাধ্যমে কয়েক মিনিটেই জেনে নিতে পারবেন।’

আমরা জন্মসূত্রে মুসলিম হয়েও ধর্মের যেসব সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারি না, অনেক সময় বহু নওমুসলিম ভাই ও বোন সেগুলো অনুধাবন করতে সক্ষম হন।

এটা তো গেল সুন্নাহ থেকে। কুরআনের কথাটা পরে আনলাম এজন্য যে, এ বিষয়ে একটু লম্বা আলোচনা করব।

ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্নকারী সেই ব্যক্তিকে সূরা আনআমের ১৫১-১৫৩ এই তিনটি আয়াত পড়ে শোনান। খুব চমৎকার ভাষায় এখানে ইসলামের শিক্ষাগুলো একত্র করা হয়েছে:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا

وَمَا بَطْنٌ وَلَا تُقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا  
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا  
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥١﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي  
مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٣٥١﴾

‘(হে নবি) বলুন, এসো আমি বলে দিই তোমাদের রব তোমাদের জন্য কী কী  
নিষেধ করেছেন। তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি  
সদ্যবহার করবে, আর সন্তানদের তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে হত্যা করো না।  
তোমাদের এবং ওদের তো আমিই রিয়ক দিই। আর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোনো  
ধরনের অশালীনতার ধারে-কাছেও যেয়ো না। আল্লাহ নিষেধ করেছেন, এমন  
কোনো প্রাণকে বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করো না। তিনি এসব বিষয়ে ওসীয়াত  
(নির্দেশনা) দিয়েছেন, যেন তোমরা বুঝতে পারো।

আর ইয়াতীমের সম্পত্তির কাছেও যেয়ো না; তবে তারা সাবালক হওয়ার আগ  
পর্যন্ত (যদি কোনো হস্তক্ষেপ করতেই হয়), তবে সর্বোত্তম উপায়ে (করবে)।  
আর আমি কারও ওপর তাঁর সাধ্যাতীত কিছু চাপিয়ে দিই না।

সাক্ষ্য দেবে ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে, যদিও তা আপনজনের ব্যাপারে হয়। আর আল্লাহর  
সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করো। তিনি (আল্লাহ) তোমাদের এসব বিষয়ে নির্দেশনা  
দিয়েছেন, যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।

নিশ্চয়ই এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথেই চলো, অন্য পথে না। না  
হলে সেসব পথ তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তিনি তোমাদের  
এ বিষয়ে ওসীয়াত করেছেন, যাতে তোমরা সংযত হও।’<sup>[৮০]</sup>

যতবার-ই পড়ি, এই মহামাঘিত আয়াতগুলো আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। থমকে  
দেয় আমাকে।

নিজে নিজে একটু ভাবুন তো, ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ কোনো ব্যক্তির কাছে এই  
আয়াতগুলো উপস্থাপন করলে রবের কালাম নিয়ে আপনার কতটা গর্ব হবে! কতটা  
আত্মতৃপ্ত হবেন যে, আমার রবের কালাম মানবীয় ফিতরাতের সাথে কী দারুণ  
সঙ্গতিপূর্ণ! এটি সকল কল্যাণের আদেশ দেয়, অনিষ্টের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ  
করে।



প্রথম থেকেই খেয়াল করুন,

‘(হে নবি) আপনি বলুন, এসো আমি বলে দিই তোমাদের রব তোমাদের জন্য  
কী কী নিষেধ করেছেন...’

তিনি কে?

তোমাদের রব, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিয়কদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। তাঁরই  
একমাত্র অধিকার আছে কোনো কিছু বৈধ-অবৈধ ঘোষণা করার, নিজের ইচ্ছেমতো  
আইন প্রণয়ন করার। মানবজাতির ওপর একমাত্র তাঁরই শর্তহীন আনুগত্য আবশ্যিক।

দেখুন, ‘رَبِّكُمْ’- তোমাদের প্রতিপালক’ কথাটা কতটা মমতাময়! তোমাদের রব, যিনি  
তোমাদের দেখাশোনা করেন, লালন-পালন করেন, তোমাদের কল্যাণ চান, তিনি  
তোমাদের এই বিষয়গুলোর নির্দেশনা দিচ্ছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন তাঁর শারীয়াহ’র মাধ্যমে মানুষের অন্তরে তাঁর  
ভালোবাসা, তার কালামের ভালোবাসা বৃদ্ধি করে দেন। আমাদের দ্বীনকে যেন  
আমাদের গৌরবের বস্তু বানিয়ে দেন। আমীন।



## আমরা কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইবাদাত করি?

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় বিশ্বাসের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। স্রষ্টা আর ধর্মপ্রচারককে এক করে ফেলে তারা। ধর্মপ্রচারকের ইবাদাত করে।

পূর্বে আলোচিত সূরা আনআমের আয়াতগুলোতে আবার চোখ বোলানো যাক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ كُفْرٍ كَبِيرٍ أَلَّا تَتَذَكَّرُوا إِنَّكُمْ أَفْكَاكُ الْمُنَىٰ

‘(হে রাসূল) বলুন, এসো আমি বলে দিই তোমাদের রব তোমাদের জন্য কী কী নিষেধ করেছেন। তোমরা তাঁর সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করবে না, পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করবে।’[৮১]

অমুসলিমরা নিজেদের ধর্মের সাথে মিলিয়ে ভাবতে পারে যে, মুসলিমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইবাদাত করে। ঠিক যেভাবে ইসা ﷺ-এর ইবাদাত করে খ্রিষ্টানরা। ফলে তাদের মনে এরকম ধারণা থাকাও স্বাভাবিক যে, মুহাম্মাদ ﷺ নিজের বড়ত্ব আর স্তুতি বর্ণনার জন্য নিজ থেকে কুরআন রচনা করেছেন।

কিন্তু এই আয়াতগুলো শুনেই একটা ধাক্কা খাবে তারা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হুক দিয়ে শুরু হলো। তার পরই দ্বিতীয় ওসীয়াত পিতা-মাতার হুক। এরপর ধারাবাহিকভাবে সন্তানের হুক, সমাজ এবং অসহায়-ইয়াতীমদের হুক। কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-এর কোনো আলোচনা নেই।

ফলে তারা সহজেই অনুধাবন করতে পারবে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন বার্তাবাহক মাত্র। তিনি না নিজেকে এর চেয়ে বড় কিছু দাবি করতেন, না

[৮১] সূরা আনআম, ৬ : ১৫১।

নিজের ব্যক্তিসত্তাকে কুরআন কাহীমের বিষয়বস্তু মনে করতেন।

আলোচনা শুরুও হয়েছে শিরকের নিষেধাজ্ঞা দিয়ে। কারণ, বান্দা যদি শিরক থেকে মুক্ত হতে না পারে, তবে পরে উল্লেখিত নেক আমলগুলোর কোনো মূল্য থাকবে না। অন্য ধর্মগুলোও কিছু-না-কিছু ভালো কাজের আদেশ দেয়, কিন্তু এই শিরকের ফাঁদেই আটকে যায় তাদের অনুসারীরা। দেখুন আল্লাহ কী বলছেন,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٢٧﴾

‘তারাই কাফির, যারা বলে যে, মরিম-পুত্র মাসীহ-ই আল্লাহ। অথচ মাসীহ বলেছেন, হে বানী ইসরাঈল, আল্লাহর ইবাদাত করো, যিনি আমার এবং তোমাদের রব। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্যে জাহান্নাম হারাম করে দেন। ফলে তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম; আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।’<sup>[৮২]</sup>

দ্বিতীয় ওসীয়াত হচ্ছে,

‘পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো।’

আল্লাহ তাআলা বলেননি, ‘পিতা-মাতার অবাধ্য হোয়ো না।’ বরং এখানে অর্থ আরও জোরালো। অবাধ্য তো হবেই না, সেইসাথে যেন সদাচরণ করতেও ভুল না হয়। যেভাবে পারো, তাদের অন্তরকে খুশি রাখতে সদা-সর্বদা সচেষ্টি থাকবে। অর্থাৎ, কুরআন আপনাকে এমন এক স্তরে নিয়ে গেছে, যেখানে পিতা-মাতার অবাধ্যতার কথা কল্পনাও করা যায় না। তাই তা থেকে নিষেধ করাও নিষ্প্রয়োজন।

আল্লাহ তাআলা কুরআনের বহু জায়গায় তাঁর ইবাদাতের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴿٤١﴾

‘আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে একের পর এক কষ্ট-ক্লেশ করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং দুই বছর দুধপান করিয়েছে। (তাই আমি) নির্দেশ দিচ্ছি যে, আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং তোমার পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর (সকলকে)

আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।’[৮৩]

আল্লাহ তাআলা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদেশের পরপরই পিতা-মাতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আদেশ দিলেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ, যে ব্যক্তি পিতা-মাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ, তার পক্ষে আল্লাহ তাআলার শুরুরিয়া আদায় করাও অসম্ভব। যেমন নবিজি ﷺ বলেছেন,

« لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ »

‘যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।’[৮৪]

আর, মানুষের মধ্যে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার হকদার পিতা-মাতার চেয়ে বেশি আর কে আছে?

[৮৩] সূরা লুকমান, ৩১ : ১৪।

[৮৪] বুখারি, আদাবুল মুফরাদ, ২১৮; সুনানু আবী দাউদ, ৪৮১১; তিরমিযি, ২০৬৯; ইমাম বুখারি ও আবু দাউদের সনদ সহীহ।



## মুখ দিয়েছেন যিনি...

আমাদের রব আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলছেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِنَّهُمْ

‘আর দরিদ্রতার ভয়ে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না; তোমাদের এবং  
ওদের তো আমিই রিয়ক দিই।’<sup>[৮৫]</sup>

দেখুন, আল্লাহ তাআলা শিশুদের ব্যাপারে কতটা স্নেহশীল! ওদের বাবা-মায়ের  
চেয়েও বেশি।

স্বাভাবিকভাবে শারয়ী কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা নিঃসন্দেহে হারাম ও গুনাহের  
কাজ। কিন্তু রাগের মাথায়, টাকার লোভে বা এ-ধরনের কোনো কারণে কাউকে হত্যা  
করার চেয়েও জঘন্য একটি অপরাধ আছে। রিয়ক কমে যাওয়ার ভয়ে নিজ সন্তান-  
সন্ততি হত্যা করা।

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাঃ বলেন,

سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ  
خَلْقَكَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ فَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ  
قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

একবার নবি সঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কোন গুনাহ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে  
বড়?’ তিনি বললেন, ‘কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ মনে করা; অথচ তিনি

তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।’ আমি বললাম, ‘এ তো সত্যিই বড় গুনাহ। তারপর কোনটা?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘অম্মে ভাগ বসাবে, এই ভয়ে আপন সন্তানকে হত্যা করা।’ আমি আরও বললাম, ‘এরপর কোনটি?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘প্রতিবেশীর জন্য বৈধ নারীর (স্ত্রী বা দাসীর) সঙ্গে ব্যভিচার করা।’<sup>[৮৬]</sup>

এখন ভাবার বিষয়, অন্যান্য সকল প্রকার হত্যার চাইতে এই হত্যা বেশি জঘন্য কেন? কারণ, আল্লাহর নাম ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে যার ঈমানে ক্রটি আছে, শুধু তার পক্ষেই সম্ভব এহেন পাপকাজ করা। আল্লাহ তাআলা যে আর-রাযযাক, এ ব্যাপারে তার সংশয় আছে। যেন আল্লাহর রিয়ক সংকীর্ণ, সন্তান এখানে ভাগ বসালে তার রিয়ক থেকে কমে যাবে! ওয়া হা-শা লিল্লাহ!

দরিদ্রতার ভয়ে নিজ সন্তানকে হত্যা করা এটাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তাআলার ওপর তার তাওয়াক্কুল নেই। থাকলেও অত্যন্ত দুর্বল।

একথার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, বাচ্চা জন্ম দিয়ে কাজকর্ম ত্যাগ করে শুধু তাওয়াক্কুলের ভান করে বসে থাকবে। এটা বরং হাদীসের নির্দেশনার বিপরীত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ

‘কেউ পাপী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার ওপর নির্ভরশীলদের রিয়ক নষ্ট করে।’<sup>[৮৭]</sup>

এই ওসীয়াতটি একটি ব্যাপক মূলনীতি তৈরি করে দেয়। এর মধ্যে ওই সকল শত্রুতা অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলো মানুষ রিয়কের ভয়ে এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল না থাকার কারণে করে থাকে।

তাওয়াক্কুলের ঘাটতি ও রিয়কের ভয় মানেই শিরকের ছাপ। শিরকের সংমিশ্রণ ঘটান কারণে সেই গুনাহের জঘন্যতা আরও বেড়ে যায়। উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে বুঝে আসবে।

১. একজন ব্যবসায়ী তার পাশের ব্যবসায়ীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিভিন্ন হারাম উপায়ে। সবসময় তার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, মালামাল নষ্ট করার ফন্দি করে। এমনকি তাকে বাজার থেকে উচ্ছেদ করার প্রয়াসও বাদ রাখে না।

কেন? এই ভয়ে যে, সে বেশি কামালে আমার রিয়ক কমে যাবে।

[৮৬] বুখারি, ৪৪৭৭; মুসলিম, ৮৬।

[৮৭] মুসনাদুশ শিহাব কুযায়ি, ১৪১১; বাইহাকি, সুনানুস সগীর, ২৮৮২, সনদ দুর্বল; তবে সহীহ সনদে সমার্থক বর্ণনা রয়েছে; মুসলিম, ৯৯৬, সহীহ।

এটাই আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুলের ঘাটতি। আল্লাহ তাআলা-ই একমাত্র রিয়কদাতা—এ বিষয়ে ঈমানের দুর্বলতা। এই ঈমানী লোকসান বা ঘাটতির কারণেই তার গুনাহের জঘন্যতা আরও বেড়ে গেছে। যেমনটা হয়েছে সম্ভান হত্যার বেলায়।

২. একইভাবে একজন চাকুরিজীবী হর-হামেশা তার কলিগের পেছনে লেগে থাকে। কলিগের অর্জনগুলোকে তুচ্ছতাক্ষিল্য করে সবসময় তার সামান্য দোষত্রুটিও ঘটা করে বলে বেড়ায়। কেন এমন করে?

সে আশঙ্কা করে, ‘কোম্পানী যদি তার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, তা হলে তো আমার প্রয়োজন শেষ হয়ে যাবে। চাকরি চলে যাবে আমার! তখন কী হবে? আমাকে তো ভিক্ষার ঝুলি ধরতে হবে তখন!’

এই ব্যক্তির ব্যাপারেও একই কথা। আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাওয়াক্কুলের ঘাটতি।

এই লোকগুলোর উচিত আল্লাহ তাআলার এই কথাকে স্মরণ করা—

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

‘তোমাদের এবং ওদের তো আমিই রিয়ক দিই।’

আপনার কলিগ, সহপাঠী, আর ব্যবসায়িক প্রতিযোগীদের যে আল্লাহ রিয়ক দিতে পারেন, তিনি কি আপনাকে রিয়ক দিতে সক্ষম নন? আল্লাহর কোষাগারে কি কোনো ঘাটতি আছে?

আল্লাহ তাআলা আমাদের তাঁর ওপর যথাযথ তাওয়াক্কুল করার তাওফীক দান করুন।  
আমীন।



## অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা

সূরা আনআমে বর্ণিত রহমানের আরেকটি ওসীয়াত ছিল—

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

‘আর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোনো ধরনের অশালীনতার ধারে-কাছেও যেয়ো না।’<sup>[১৮]</sup>

আয়াতে ‘ফাওয়াহিশ’ বা ‘ফাহিশা’ কাজ বলতে বোঝানো হয়েছে অশ্লীল কাজ বা গুনাহের কাজ, বিশেষত কবীরা গুনাহ।

এখানে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়:

এক.

আল্লাহ তাআলা এখানে বলেননি, ‘অশালীন কাজ করো না।’ বরং বলেছেন, ‘অশালীন কাজের ধারে-কাছেও যেয়ো না।’

অর্থাৎ, কবীরা গুনাহের দিকে নিয়ে যায়, এমন প্রত্যেক বিষয়কেই এখানে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে জিনিস আপনার আর কবীরা গুনাহের মধ্যকার পর্দা উঠিয়ে দেবে, তা-ই নিষিদ্ধ।

উদাহরণস্বরূপ:

- \* কোনো হারাম বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেয়া।
- \* নারী-পুরুষ নির্জনে একত্রিত হওয়া।

[১৮] সূরা আনআম, ৬ : ১৫১।

\* চরিত্র-বিধংসী গান-বাজনা।

যে ব্যক্তি এসবের মধ্যে জড়িয়ে পড়ল, সে আল্লাহর আদেশের খেলাফ করে গুনাহগার হয়ে গেল। কারণ এ-কাজগুলো সরাসরি অশালীন না হলেও এগুলো চূড়ান্ত গুনাহের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়।

দুই.

আয়াতে উল্লেখিত ‘অপ্রকাশ্য অশালীন’-এর মানে কী, এটা বোঝা দরকার।

অনেক মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন, এগুলো হচ্ছে গোপনে সংঘটিত কবীর গুনাহ।

এই অর্থটি সঠিক। তবে এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট মর্মার্থ আছে। এটাও অনেক মুফাসসিরের তাফসীর থেকে জানা যায়। তারা বলেন, ‘অপ্রকাশ্য অশালীনতা’ হচ্ছে অন্তরের আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট পাপাচার।

যেমন, ‘রিয়্য’ একটি অপ্রকাশ্য পাপকাজ। আপনি সাদাকাহ করছেন এই নিয়তে যে, মানুষ আপনার প্রশংসা করবে। মানুষকে দ্বীনি কোনো পরামর্শ বা শিক্ষা দিচ্ছেন, কিন্তু সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করলেন না। করলেন মানুষ আপনাকে ভালো বলবে, এ জন্য। আপনার এ-ধরনের মন-মানসিকতাই অপ্রকাশ্য কদর্যতা, বাতিনী অশালীনতা।

অন্তরের এই গোপন অশালীনতার মধ্যে আরও রয়েছে:

- \* আল্লাহর নাযিলকৃত কোনো কিছুকে অপছন্দ করা।
- \* দ্বীনের কোনো বিধানকে, দ্বীনের কোনো শিআর-কে (চিহ্ন) অপছন্দ করা।
- \* তাকদীরের ফায়সালার ওপর অসন্তুষ্ট হওয়া।
- \* অহংকার।

একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অনেক সময় এই প্রকাশ্য অশালীনতাগুলো প্রকাশ্য অশালীনতার চেয়েও নিকৃষ্ট হয়।

একটু লক্ষ করুন নবিজি ﷺ কী বলেছেন—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ

‘যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’ [৮৯]

আলোচ্য আয়াতের মর্মার্থ যদি আমরা বুঝে থাকি, তবে এটাও উপলব্ধি করতে পারব যে, উলামায়ে কেরাম ‘হিরাসাতুল বাতিন’ বা কলবের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা বলতে



কী বুঝিয়ে থাকেন।

আল্লাহর একটি নাম ‘رفيب’ (মহাপর্যবেক্ষক)-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম رحمہ اللہ বলেন,

‘বান্দা যখন এটা উপলব্ধি করতে পারে যে, তার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নড়াচড়া, চলাফেরা সব কিছু আল্লাহ তাআলার বেষ্টনে আবদ্ধ; এবং সে যদি এই উপলব্ধিকে সর্বদা-সর্বাবস্থায় নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে, তবে এই উপলব্ধি-ই তার কলবের অভ্যন্তরকে সকল খারাপ চিন্তা-ফিকির থেকে রক্ষা করবে। এমনসব চিন্তা-ফিকির, যেসবের মধ্যে আল্লাহ তাআলার অসন্তোষ থাকে।’<sup>[১০]</sup>

তাই যখনই কোনো বিপদ-আপদের কারণে বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়বেন, তাকদীরের প্রতি বিতৃষ্ণাভাব চলে আসবে, তখন আপনার কাজ হবে মনোজগতকে সজাগ করা। মন থেকে ঝোঁটিয়ে বিদায় করবেন এসব বাজে চিন্তা-ভাবনা। এরপর এসব দূষিত চিন্তা-ভাবনার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে ইসতিগফার করবেন। হুবহু প্রকাশ্য গুনাহ থেকে তাওবা করার মতোই।

যদি আপনার তাওবা খাঁটি হয়, তবে আল্লাহ তাআলা আপনাকে সাহায্য করবেন, আপনার তাওবা কবুল করবেন।

প্রিয় ভাই ও বোন,

নিজের অভ্যন্তরকে অপ্রকাশ্য অশালীনতা থেকে মুক্ত করার এই বিষয়টিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ এমন মানুষ আছে, যে বাহ্যিক চলাফেরায় তাকওয়াবান, মানুষ তাকে ভালো বলে। এমনকি নিজেকেও মুত্তাকীই ভাবে সে। কারণ, পাপে জর্জরিত হাজারো মানুষের মধ্যে সে প্রকাশ্য গুনাহের কাজগুলো থেকে বিরত থাকছে।

তবে একই সাথে সে অন্তরের অভ্যন্তরীণ অশালীনতায় লিপ্ত। আত্মপ্রচারের আগ্রহ, তাকদীরের ফায়সালার ওপর অসন্তুষ্টি, আল্লাহর বিভিন্ন বিধান অপছন্দ করা-সহ বহু চিন্তার দূষণ দূষিত করে রেখেছে তার কলবকে।

আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষায় আল্লাহ তাআলা আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের ভেতর-বাহির পবিত্র রাখুন।

পরিশেষে আবারও বলছি, আমরা যেন রবের কারীমের ওসীয়তটা ভুলে না যাই,

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

[১০] ইবনু সাদী, তাফসীরু আসমাইল্লাহিল হুসনা, ২০৭; শাইখ আবদুর রহমান সাদী ইবনুল কাইয়্যিম رحمہ اللہ-এর বক্তব্যকে নিজের মতো করে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল কাইয়্যিম رحمہ اللہ-এর বক্তব্য রয়েছে: তরীকুল হিজরতাইন,



‘আর প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কোনো ধরনের অশালীনতার ধারে-কাছেও যেয়ো  
না।’<sup>(১১)</sup>

## এটাও হত্যা

ইতোমধ্যে আমরা সূরা আনআমে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার ওসীয়তগুলোর কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করেছি।

আসুন, এখন আরেকটি ওসীয়ত নিয়ে কথা বলি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

‘...এবং আল্লাহ নিষেধ করেছেন, এমন কোনো প্রাণকে বৈধ কারণ ছাড়া হত্যা করো না।’

মানুষকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন। এর মধ্যে মুসলিম ও অমুসলিম (আশ্রিত, চুক্তিবদ্ধ, বেসামরিক অমুসলিম) উভয়-ই অন্তর্ভুক্ত।

একজন মানুষকে হত্যা করে ফেলা, যাকে আল্লাহ তাআলা মহিমান্বিত করেছেন, তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটা শুধু একটা হত্যা-ই নয়; বরং সরাসরি আল্লাহর সাথে শত্রুতার শামিল, আল্লাহর হকের মাঝে হস্তক্ষেপ করার নামান্তর।

হত্যাকারী একটা প্রাণ কেড়ে নিল। কিন্তু তাকে একবারও এ-বিষয়টি নাড়া দিলো না যে, এই প্রাণ-পাখির মালিক আল্লাহ তাআলা একে পরম যত্নে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইবাদাতের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।

এরচেয়ে বড় অপরাধ আর কী হতে পারে!

ছোট ছোট বাচ্চাদের বুক থেকে ওদের বাবাকে কেড়ে নেয়া, তার আদর-সোহাগ আর স্নেহমাখা চুমু থেকে ওদের বঞ্চিত করা, এরচেয়ে জঘন্য অপরাধ আর কী হতে পারে?

## ইয়াতীমের সম্পদ

রব্বুল আলামীনের আরেকটি ওসীয়াত। তিনি বলছেন,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

‘আর ইয়াতীমের সম্পত্তির কাছেও যেয়ো না। তবে তারা সাবালক হওয়ার আগ পর্যন্ত (যদি কোনো হস্তক্ষেপ করতেই হয়), তবে সর্বোত্তম উপায়ে (করবে)।’<sup>[৯৫]</sup>

দয়াময় আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তাআলা তাঁর দুর্বল-ইয়াতীম বান্দাদের প্রতি কতটা স্নেহশীল! তিনি তাঁর অনাথ-অসহায় বান্দাদের অধিকারের পক্ষে কত শক্তভাবে কথা বলছেন!

আল্লাহ তাআলা বলেননি, ‘ইয়াতীমদের সম্পদ খরচ করো না।’ বরং শক্ত হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন, ‘ইয়াতীমের সম্পত্তির কাছেও যেয়ো না।’

যাতে করে ইয়াতীমদের সম্পদের কথা কারও চিন্তায়ও না আসে।

এরপর বলেননি, ‘তবে ন্যায়সঙ্গতভাবে খরচ করতে পারবে’। বরং বললেন, ‘করতে হলে সর্বোত্তমভাবে খরচ করবে।’

অর্থাৎ, তারা সাবালক হওয়ার আগ পর্যন্ত যদি তাদের সম্পদে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতেই হয়, তবে ভেবেচিন্তে করবে। তাদের প্রয়োজনের খরচাপাতি এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় এই উভয়ের মাঝে ভারসাম্য রাখতে হবে। সর্বোত্তম পন্থা মানে যেখানে ইয়াতীমদের সর্বোচ্চ কল্যাণ সাধিত হয়। এরপর যখন তারা সাবালক হয়ে যাবে,



নিজেদের বিষয়গুলো নিজেরা সামলাতে শিখবে, তখন ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের বাকি সম্পদ।

আল্লাহ তাআলা কত চমৎকারভাবে তার বান্দাদের অন্তরকে অসহায় ও দুর্বলদের প্রতি সহানুভূতিশীল করে দিলেন।

তবে এখানে না কোনো বাড়াবাড়ি, না কোনো ছাড়াছাড়ি। আল্লাহ তাআলা চান না যে, তাঁর বান্দারা ইয়াতীমদের সাথে আচরণ করতে গিয়ে সমস্যায় বা সঙ্কীর্ণতায় পড়ে যাক।

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

‘আর ইয়াতীমের সম্পত্তির কাছেও যেয়ো না; তবে তারা সাবালক হওয়ার আগ পর্যন্ত (যদি কোনো হস্তক্ষেপ করতেই হয়), তবে সর্বোত্তম উপায়ে (করবে)।’<sup>[৯৬]</sup>

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

‘যারা ইয়াতীমদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করে, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করে; তারা অতিসত্ত্বর জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’<sup>[৯৭]</sup>

এই আয়াতদ্বয় নাযিল হওয়ার পর কী হলো, সে ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস  বলেন—

আল্লাহ যখন এই দুই আয়াত নাযিল করলেন, তখন যাদের তত্ত্বাবধানে ইয়াতীম ছিল, তারা নিজেদের খাদ্য-পানীয় থেকে ইয়াতীমের খাদ্য-পানীয় আলাদা করে দেন।

ইয়াতীমের উদ্বৃত্ত খাবার রেখে দেয়া হতো। পরে তা ইয়াতীমরাই খেতো নতুবা নষ্ট হয়ে যেতো। ইয়াতীমদের লালন-পালনের বিষয়টি কঠিন হয়ে দাঁড়ায় সাহাবায়ে কেরামের কাছে। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ -এর কাছে উপস্থাপন করলেন তাঁরা।

তারপর মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمُ إِنَّا اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

‘আর তারা আপনাকে ইয়াতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে। বলুন, তাদের সাথে উত্তম পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয়। যদি তোমাদের (খাদ্য-পানীয়) তাদের পানাহারের সাথে একত্র রাখো, তবে মনে করো তারা তোমাদের

[৯৬] সূরা আনআম, ৬ : ১৫২।

[৯৭] সূরা নিসা, ৪ : ১০।

ভাই! বস্তুত, অকল্যাণকামী ও কল্যাণকামীদের আল্লাহ চেনেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের ওপর জটিলতা আরোপ করতে পারতেন। (তবে তিনি তা করেননি) নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, মহাপ্রাজ্ঞ।<sup>[৯৮][৯৯]</sup>

আল্লাহ তাআলা জানেন কে ইয়াতীমের মাল সম্পদ নষ্ট করতে চায় আর কে ইয়াতীমের কল্যাণ চায়। তাই বান্দারা সমস্যায় পড়বে, এমন কড়াকড়ি বিধান দেননি তিনি।

এরপর সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের পানাহার ইয়াতীমদের পানাহারের সাথে আবারও একত্র করলেন।

হ্যাঁ বন্ধু! এটাই ইসলামি আইনের ভারসাম্য। ইসলাম সমাজের সকল শ্রেণির সকল মানুষের অধিকার রক্ষা করে; অন্য শ্রেণিকে কোনোরূপ সমস্যা বা জটিলতায় না ফেলেই। পক্ষান্তরে মানবরচিত তত্ত্ব-মন্ত্র আর আইন-সংবিধান এটা করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এসবের অবস্থা তো হচ্ছে, এক শ্রেণির মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আরেক শ্রেণিকে আপ্যায়ন!

তাই, রহমানের এই কল্যাণময় ওসীয়াত যেন ভুলে না যাই আমরা।



## মদ নয়, ড্রিংকস; সুদ নয়, মুনাফা

শব্দচয়ন এবং নামকরণের একটা আলাদা শারয়ী গুরুত্ব আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا

‘হে মুমিনগণ, তোমরা ‘রায়িনা’ বোলো না; বরং বোলো ‘উনযুরনা’।’<sup>[১০০]</sup>

নবিজি ﷺ-ও হাদীসের বহু জায়গায় গুরুত্ব দিয়েছেন শব্দচয়নের ওপর। তিনি এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন, বক্তার নিয়তের ওপর নির্ভর করে যেগুলোর অর্থ ভালোমন্দ উভয়ই হতে পারে।

এখন শব্দচয়ন ও এর প্রয়োগের গুরুত্ব নিয়ে কিছু কথা বলব আমরা। দেখাতে চেষ্টা করব যে, প্রত্যেক বস্তুর ওপর তার নামকরণের একটা বিশেষ প্রভাব পড়ে।

একটু বুঝিয়ে বলছি।

আল্লাহ তাআলা কিছু বিষয়কে আমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। হারাম হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই এগুলো একটু অন্যরকম লাগে আমাদের কাছে। অন্তরে এসব বস্তুর প্রতি ঘৃণা থাকে। কিন্তু শয়তান-মালাউন এগুলোকে চমৎকার চমৎকার নাম দিয়ে আমাদের সামনে ভালো হিসেবে উপস্থাপন করে। মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করতে

[১০০] সূরা বাকারাহ, ২ : ১০৪; এই আয়াতের শানে নুযূলে তাফসীরের কিতাবগুলোতে যেমনটি পাওয়া যায় তার সারকথা হলো,

‘রায়িনা’ শব্দের দুটি অর্থ: ক. আমাদের দিকে তাকান, খ. আমাদের রাখাল।

মদীনার ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলার মাঝখানে বলত, ‘রায়িনা’। কিন্তু নিয়ত থাকতো দ্বিতীয় অর্থের দিকে। পরবর্তীতে মুসলিমরাও এই শব্দ ব্যবহার করতে শুরু করে। যদিও মুসলিমদের মধ্যে রাসূলকে অপমান করার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না, তথাপি আল্লাহ তাআলা এটিকে অপছন্দ করলেন। ‘রায়িনা’ শব্দের পরিবর্তে নির্দেশ দিলেন একই অর্থে ‘উনযুরনা’ (আমাদের দিকে তাকান) শব্দ ব্যবহার করার।—অনুবাদক



এটাই হচ্ছে ওর প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ।

মদের কথাই ধরুন। ‘খামর’ অর্থ আচ্ছন্ন করা, আবৃত করা, ঢেকে নেয়া। যেহেতু মদ মানুষের বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তাই একে আরবিতে বলা হয় ‘খামর’। বাংলায় ‘মদ’, ‘মদিরা’ শব্দগুলোর মূল অর্থও অনুরূপ। বোধশক্তিকে যা আবিষ্ট, মত্ত, মদির করে দেয়, তা-ই মদ ও মাদক।

কিন্তু বর্তমানে মদের সাধারণ নাম হয় ‘ড্রিংকস’। পানীয়, স্নেফ পানীয়, আর কিছুই না! অতিথি আপ্যায়নে অবিচ্ছেদ্য উপাদেয়, বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় এক অনন্য অনুষঙ্গ। এতে ঘৃণা বা খারাপ লাগার কিছু নেই! বিশেষ বিশেষ প্রকারের জন্য আবার আলাদা নাম ‘ওয়াইন’, ‘বিয়ার’ ইত্যাদি।

মজার ব্যাপার হলো, নবিজি ﷺ কিন্তু এ ব্যাপারে আগেই জানিয়ে গেছেন,

لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامُ حَتَّى تَشْرَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَوِّنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

‘(কোনো এক যুগে) আমার উম্মাহর কিছু লোক মদকে ভিন্ন নামে নামকরণ করে তা পান করবে।’<sup>[১০১]</sup>

অতএব বোঝা গেল, কোনো হারাম বিষয়ের নাম পরিবর্তন করা হয় কেন? এটাকে বৈধ করার জন্য। অন্তত এর পাপের ব্যাপারে শিথিলতা দেখানোর মতলবে।

একইভাবে, সুদের বিষয়টা দেখুন। এটাকে এখন নাম দেয়া হয়েছে ইন্টারেস্ট, মুনাফা। ‘অমুক ব্যাংক থেকে আমি এত টাকা মুনাফা পেয়েছি।’

মুনাফা শব্দটা তো ভালো; হালাল লেনদেন থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশই মুনাফা। কিন্তু সুদের ক্ষেত্রে এই শব্দ ব্যবহার করে যেন বোঝানো হচ্ছে, সুদও ক্রয়-বিক্রয়ের একটি প্রকার।

এখানে আল্লাহ তাআলার এই কথাটি স্মরণ করার মতো—

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

‘তারা (কাফিররা) বলে, ক্রয়-বিক্রয়ও (ব্যবসাবাগিজ্য) তো সুদের মতোই।’<sup>[১০২]</sup>

সাথে সাথে আল্লাহ তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে বলে দিলেন—

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

‘আর আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।’<sup>[১০৩]</sup>

[১০১] সুনানু ইবনি মাজাহ, ৩৩৮৪, সহীহ লিগাইরিহি।

[১০২] সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭৫।

[১০৩] প্রাপ্ত।

সুতরাং, আমরা আল্লাহর হারাম বিষয়গুলো ওই নামেই ডাকব, যেটা তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে যাব না। যাতে শিথিলতা চলে না আসে সেসব হারামের ব্যাপারে।

এজন্য যখন আপনাকে বলা হবে, ‘অমুক ব্যাংক কি মুনাফা দেয়?’ আপনি বলবেন, ‘মানে সুদের কথা বলছেন?’

সে হয়তো তখন বলবে, ‘আরে একই তো কথা!’ তখন আমরা স্পষ্ট করে বলে দেবো, শব্দ চয়নেরও একটা শরয়ী গুরুত্ব আছে। তাকে স্মরণ করিয়ে দেবো এই আয়াত—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا وَقُولُوا انْظُرْنَا

‘হে মুমিনগণ, তোমরা ‘রায়িনা’ বোলো না; বরং বোলো ‘উনযুরনা’।’<sup>[১০৪]</sup>

একইভাবে পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। আমরা কোনো মুসলিমের ক্ষেত্রে যেন ‘মৌলবাদী’, ‘উগ্রবাদী’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার না করি। এই শব্দগুলো মূলত ওইসব লোকগুলোই ব্যবহার করে থাকে, যাদের কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথার, শারীয়াহ’র বিধানের বিন্দুমাত্র মূল্যায়ন নেই। তাদের কাছে হারাম পরিত্যাগ করা হচ্ছে ‘মৌলবাদ’, আর দ্বীনের ওপর অটল থাকার নাম হচ্ছে, ‘উগ্রবাদ’।

কোনো মুসলিম নিজের বা অন্যের ব্যাপারে শারীয়াহ’র সীমানা লঙ্ঘন করলে সেটাকে ‘ইফরাত’ (বাড়াবাড়ি) বলব। তবুও যেন দ্বীন-বিরোধীদের শেখানো বুলি না আওড়াই। না হলে ওদের মাঝে আর আমাদের মাঝে পার্থক্যটা থাকল কোথায়?

পরিশেষে আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ‘রায়িনা’ শব্দ ব্যবহার করে নবিকে সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন। কেন?

কারণ, এই শব্দটা ইয়াহুদীরা মন্দ নিয়তে ব্যবহার করতো। তার মানে কী? আল্লাহ তাআলা চান বাতিল কাফির-মুশরিকদের চেয়ে তাঁর মুমিন বান্দাদের স্বতন্ত্রতা বজায় থাকুক; এমনকি শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও। এমনকি দ্ব্যর্থবোধক শব্দের একটি অর্থ ভালো হলেও!

এজন্যই একজন মুসলিম আকীদা-বিশ্বাসে হবে স্বতন্ত্র। কথাবার্তায় হবে স্বতন্ত্র, সীরতে-সুরতে হবে স্বতন্ত্র।

কারণ, মুসলিম তো সেই ‘শ্রেষ্ঠ উম্মাহর’ একজন গর্বিত সদস্য, ‘যাদের বের করা হয়েছে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য, কল্যাণের জন্য।’

[১০৪] সূরা বাকারাহ, ২ : ১০৪।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

'তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মাহ, মানবজাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে।'[১০৫]



## সীসাঢালা প্রাচীর

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُورٌ

‘আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে সীসাঢালা প্রাচীরের মতো লড়াই করে।’<sup>[১০৬]</sup>

হ্যাঁ, সীসাঢালা প্রাচীর, সুদৃঢ়-মজবুত দেয়াল। যদিও আল্লাহ তাআলা সাদৃশ্যটি দিয়েছেন মুমিনদের যুদ্ধাবস্থার সাথে, জীবন-যুদ্ধের প্রতিটি রণাঙ্গনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

নবিজি ﷺ বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

‘মুমিন মুমিনের জন্য প্রাচীর সদৃশ, যার একাংশ অন্য অংশকে মজবুত করে।’

এরপর তিনি এক হাতের আঙুলগুলো অন্য হাতের আঙুলে ঢুকিয়ে সাদৃশ্য দেখান।<sup>[১০৭]</sup>

কোনো দেয়াল সুদৃঢ়-মজবুত হতে হলে দুইটি বিষয় জরুরি:

১. দেয়ালের ইটগুলো শক্ত ও মজবুত হতে হবে।
২. ইটগুলোকে একসাথে ঠাঁটে রাখার জন্য ভালো মানের সুরকি বা সিমেন্ট থাকতে হবে।

এই দুই উপাদানের কোনো একটির ঘাটতি থাকলে, দেয়াল ভেঙে ফেলা বা ধ্বংস করা

[১০৬] সূরা সফ, ৬১ : ৪।

[১০৭] বুখারি, ৬০২৬; মুসলিম, ২৫৮৫।

একেবারে সহজ ব্যাপার। সেই দেয়ালকে আর 'সীসাঢালা প্রাচীর' বা সুদৃঢ়-মজবুত দেয়াল বলা যাবে না।

এবার আসি মুসলিম সমাজের অবস্থায়। কোনো কোনো সমাজের মুসলিমরা ব্যক্তিজীবনে ঈমান-আকীদা ও ইলম-আমলে বেশ ভালো। কিন্তু তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবস্থা একেবারে নড়বড়ে। তাদের না আছে পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ, মিল-মুহাব্বত; না আছে শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক সহযোগিতামূলক কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন।

এই সমাজের ইটগুলো লোহা বা তামার; বেশ মজবুত। কিন্তু সিমেন্ট-সুরকির অবস্থা যাচ্ছেতাই। তাই মজবুত ইট থাকা সত্ত্বেও এই দেয়াল ভেঙে ফেলতে সময় লাগবে না।

আবার পুরো বিপরীত চিত্রও আছে কিছু মুসলিম সমাজে। সেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ ভালো। নিজেদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ, মিল-মুহাব্বত খুব চান্দা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও একসাথে কাজ করে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত ঈমান-ইলম ও দ্বীনদারিতার অবস্থা খুবই নাজুক।

এই সমাজের সিমেন্ট-প্লাস্টার খুব উন্নত; কিন্তু ইটগুলো একেবারে থার্ড ক্লাসের। যেনতেন প্লাস্টিক বা হাওয়া-ভরা কার্টনের। এই দেয়াল ভেঙে ফেলাও তেমন কঠিন কিছু নয়।

যুদ্ধের সেনাবাহিনী ও সমাজের মতো পরিবারের ক্ষেত্রেও একই কথা। কিছু পরিবারের সদস্যরা ব্যক্তিগতভাবে সকলে বেশ দ্বীনদার; কিন্তু পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক একেবারে নিষ্প্রাণ-নিষ্প্রভ। বিপরীত চিত্রও আছে, পারস্পরিক সম্পর্ক বেশ জোরালো; কিন্তু ব্যক্তিগত ঈমান-আকীদা, ইলম-আমলে দুর্বল।

এই দুই পরিবারের কোনোটিই আদর্শ মুসলিম পরিবারের উদাহরণ নয়।

মুসলিমদের প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, সংগঠন সবক্ষেত্রেই একই মূলনীতি প্রযোজ্য।

যদি আমরা এই সব ক্ষেত্রে (পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন প্রভৃতি) আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি চাই, তবে আমাদের হতে হবে আলোচ্য দুই বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ সীসাঢালা প্রাচীরের মতো। সুদৃঢ়, মজবুত।

## লাঞ্ছনার চার-হেতু

আমরা সকলেই সম্মানিত হতে চাই। লাঞ্ছনা কেউ-ই পছন্দ করি না। আর জীবন এই দুইয়ের মাঝেই। হয়তো সম্মানের, নয়তো লাঞ্ছনার। মুর্থ-জাহিল-কপটরাও হয়তো লাঞ্ছনার জীবন চায় না।

কিন্তু একটি বিষয়ে সতর্ক থাকা চাই। কীসে সম্মান আর কীসে লাঞ্ছনা, তা সঠিকভাবে বুঝতে হবে। আপনি-আমি হয়তো সম্মানের জন্য এমন কিছু করি, যাতে সম্মান তো নেই-ই বরং তাতে লাঞ্ছনার পথই প্রসারিত হবে।

সেটা কী?

আল্লাহর নাফরমানী।

নাফরমানী যে লাঞ্ছনার দিকে নিয়ে যায়, কিতাবুল্লাহ'র এর কোনো দলীল আছে?

আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

ضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الدَّلَّةَ أَيُّنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا يَحْبِلُ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضَرَبْتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

‘আল্লাহর অঙ্গীকার কিংবা মানুষের অঙ্গীকার ছাড়া ওরা যেখানেই অবস্থান করেছে, সেখানেই ওদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ওরা কামাই করেছে আল্লাহর গযব এবং ওদের ওপর চাপানো হয়েছে দারিদ্র্য (ভীতি)। এগুলো এ কারণে যে, ওরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অনবরত অঙ্গীকার করেছে এবং নবিগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এগুলোর এও কারণ যে,



ওরা নাফরমানী করেছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে।<sup>[১০৮]</sup>

ভাবুন তো, আল্লাহ তাআলা কেন ইয়াহুদীদের লাঞ্ছনার কারণগুলো আমাদের কাছে বর্ণনা করলেন?

যেন আমরাও এসবের মধ্যে জড়িয়ে না যাই।

নবিজি ﷺ-ও বলেছেন,

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِرًّا بِشِيرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ سَلَكَوا جُحْرَ ضَبٍّ  
لَسَلَكَتُمُوهُ فُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ؟

‘অবশ্যই অবশ্যই তোমরা তোমাদের (শেষ অংশ) আগের লোকেদের নীতি-  
পদ্ধতিকে বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে (হুবহু) অনুকরণ করবো। এমনকি  
তারা যদি গুই সাপের গর্তে ঢুকে, তাহলে তোমরাও তাদের অনুকরণ করবো।’  
সাহাবিরা বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, (আগের লোকেরা বলতে) এরা কি  
ইয়াহুদী ও নাসারা?’ তিনি বললেন, ‘আর কারা?’<sup>[১০৯]</sup>

অর্থাৎ, তারা যেসব নাফরমানীতে লিপ্ত হয়েছিল, সাবধান না থাকলে আমরাও সেসবে  
লিপ্ত হয়ে যাব। ফলে তাদের যেই পরিণতি হয়েছিল, আমাদেরও তা-ই হবে।

আল্লাহ তাআলা ইয়াহুদীদের কথা উল্লেখ করে আমাদের সজাগ করলেন, যেন ওই  
বিষয়গুলোতে আমরাও সংশোধিত হয়ে যেতে পারি।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা লাঞ্ছনার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন, যেগুলো বর্তমান  
সময়ের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সে কারণগুলো হলো—

১. আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করা

২. নবিদের অন্যায়ভাবে হত্যা করা

যেমনটি বর্তমান সময়ে নবিদের পথে দাওয়াত দেয়ার কারণে দায়ী ইল্লাল্লাহদের হত্যা  
করা হয়। এ-বিষয়ে অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

‘...তারা নবিদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে, আর সেসব লোককেও হত্যা করে,  
যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়...।’<sup>[১১০]</sup>

[১০৮] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১১২।

[১০৯] বুখারি, ৩৪৫৬।

[১১০] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ২১।

কোনো সমাজের অবস্থা যদি এমন হয় যে, সেখানে দ্বীনের দায়ীদের হত্যা করা হয়, সমাজচ্যুত করা হয়, তাদের সাথে শত্রুতা করা হয়; আর জনগণ কাপুরুষের মতো চুপ করে থাকে; যালিমের ভয়ে, দুনিয়ার ভালোবাসার কারণে, পার্থিব ভোগবিলাস চলে যাবার আশঙ্কায় যদি তারা আল্লাহর পথের এসব দায়ীদের সাহায্যে এগিয়ে না আসে, তবে এই সমাজের লোকদের আল্লাহ তাআলা কখনো সম্মানিত করবেন না, কখনো মর্যাদার আসনে বসাবেন না।

কেনই-বা আল্লাহ তাআলা এসব লোকদের মর্যাদা দেবেন, যারা তাঁর দ্বীনের সম্মান করে না, দ্বীনের দায়ীদের মর্যাদা দেয় না?

এজন্য আমাদের সকলেরই ভাবা দরকার যে, নির্বাসিত-কারারুদ্ধ আর মাযলুম দায়ীদের জন্য আমরা কী করতে পারছি, কতটুকু করতে পারছি? সেটা পৃথিবীর যে-কোনো দেশেই হোক না কেন।

### ৩. নাফরমানি

ব্যাপকভাবে যখন নাফরমানি তথা গুনাহের কাজ ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা জাতিকে লাঞ্ছনার দিকেই নিয়ে যায়।

আল্লাহর বান্দা, সতর্ক হোন! দেখুন, নবিজি ﷺ বলেছেন,

وَجُعِلَ الدَّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي

‘অপমান আর লাঞ্ছনা রাখা হয়েছে তাদের জন্য, যারা আমার আদেশ অমান্য করে।’[১১১]

ভাই ও বোন আমার!

عِنْدَمَا تَعْصِي تَذَكَّرْ \*\*\* أَنَّ هُنَاكَ ضَرِيْبَةً سَتَذْفَعُهَا  
رَأَيْتِ الذُّنُوبَ تَمِيْتُ الْقُلُوبَ \*\*\* وَقَدْ بُورِثَ الدَّلُّ إِدْمَانُهَا  
وَتَرَكَ الذُّنُوبَ حَيَاةَ الْقُلُوبِ \*\*\* وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عَصِيَانُهَا

যখন গুনাহ করেন, মনে রাখবেন আপনাকে এর মূল্য দিতে হবে  
ভেবে দেখুন, পাপাচার আপনার হৃদয়ের মৃত্যু ঘটিয়ে লাঞ্ছনার মাটিতে দাফন করে  
দেবে

আর গুনাহ ছেড়ে দিলে আপনার হৃদয়-জমিনে প্রাণ সঞ্চর হবে,



আপনার জীবনে কল্যাণ বয়ে আনবে।<sup>[১১২]</sup>

#### ৪. সীমালঙ্ঘন করা

সীমালঙ্ঘনকারী সাধারণত নিজের স্বার্থ-সম্মানের জন্য অন্যের ক্ষতি করে, অন্যের ওপর যুলুম-অত্যাচার করে। গুনাহের মাধ্যমে সম্মান কেনার নেশায় মত্ত থাকে সে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সম্মান তো পায়-ই না। উলটো আল্লাহর পক্ষ থেকেই তার ওপর লাঞ্ছনা নেমে আসে।

পক্ষান্তরে যদি এর বিপরীত করতে পারেন, তা হলে আপনার জন্য নবিজির এই হাদীস:

‘তিনটি বিষয়ে আমি কসম করছি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, যে ব্যক্তি যুলুমের শিকার হয়ে ধৈর্যধারণ করল, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।’

অর্থাৎ, সীমালঙ্ঘনের বদলে পালটা সীমালঙ্ঘন না করে ধৈর্য ধরে থাকা।

মোটকথা, আমরা লাঞ্ছনার ৪টি কারণ পেলাম:

১. আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করা।
২. দায়ী ইলাল্লাহদের লাঞ্ছিত করা এবং দাওয়াতের কাজ করতে যুলুমের শিকার হলে তাদের সাহায্য না করা।
৩. নাফরমানি।
৪. সীমালঙ্ঘন।

আমরা যেন এগুলোর ব্যাপারে সতর্ক থাকি। আল্লাহ আমাদের উভয় জাহানে সম্মানিত করুন।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا

‘যে মর্যাদা চায়, সে জেনে রাখুক আল্লাহ-ই সকল মর্যাদার মালিক।’<sup>[১১৩]</sup>



## আড়ালে তার সূর্য হাসে

আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি, অসহায় মুসলিম দেশগুলোর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর দুর্দশার করুণ চিত্র। এই যে আমাদের বিপর্যয়গুলো একের পর এক দীর্ঘায়িত হচ্ছে, এখানে আল্লাহ তাআলার কী হিকমাহ রয়েছে, এটা হয়তো আমরা সেভাবে ভেবে দেখি না।

বাস্তবেই এখানে আল্লাহ তাআলার এক বিরাট হিকমাহ রয়েছে।

কী সেটা?

আল্লাহ তাআলা চান না যে, তাঁর বান্দারা শুয়ে-বসে বিজয় অর্জন করে ফেলুক। তিনি চান না তাঁর বান্দারা এর মাধ্যমে আত্মপ্ররোচিত-দাস্তিক হয়ে যাক, রবের নিয়ামাত-বিস্মৃত অকৃতজ্ঞ হয়ে যাক। অনেক সময় তো এমনও হয় যে, বিজয়ের নেশায় মত্ত বিজেতা আগাগোড়া এক রক্তচোষা স্বৈরাচারী হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা এমন বিজয় দিতে চান না তাঁর মুমিন বান্দাদের।

এজন্যই বিজয়ের পূর্বে আহকামুল হাকিমীন তাঁর বান্দাদের কষ্ট-নির্যাতনে ফেলেন, বিপর্যয় আর ভোগান্তিতে ফেলে পরীক্ষা করেন; যাতে করে বান্দারা নিজেদের দুর্বলতা, অক্ষমতাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে। যাতে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবন করতে পারে যে, বিজয় একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই, আমাদের কোনো ক্রেডিট নেই।

একটু ভেবে দেখুন তো, কুরআনের কোন আয়াতে এ কথাগুলোর ইঙ্গিত আছে!

আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

‘আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে

অপদস্থা।<sup>[১১৪]</sup>

লক্ষ করুন, আল্লাহ বলছেন, ‘তোমরা ছিলে অপদস্থা’

ইমাম ইবনুল কাইয়ীম رحمہ اللہ বলেন,

‘আল্লাহ যখন বান্দাদের পরীক্ষা করেন, তখন তারা প্রথমে অপমানিত-অপদস্থ হয়, পরাজিত ও ব্যর্থ হয়। এরপরই আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান এবং বিজয় পাওয়ার উপযুক্ত হয় তারা। কারণ, বিজয়ের পতাকা উত্তোলিত হয় ব্যর্থতা আর পরাজয়ের ধ্বংসস্তূপ ভেদ করেই। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের তারবিয়াত দেয়ার এটিও একটি হিকমাহ।

“আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে অপদস্থা।”

বিপরীতে হুনায়েনের যুদ্ধের ব্যাপারে কী বলেছেন দেখুন,

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَرْثُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ  
عَنكُمْ شَيْئًا

‘আল্লাহ তোমাদের অনেক স্থানে সাহায্য করেছেন এবং (সাহায্য করেছেন) হুনায়েনের যুদ্ধের দিন। যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোনো উপকারে আসেনি...।’<sup>[১১৫]</sup>

তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন তাঁর বান্দাদের সাহায্য করতে চান, বিজয় দিতে চান, তখন বিজয়ের আগে তাদের পরাজয় আর ব্যর্থতার পথ মাড়িয়ে আনেন। এবং এই বিজয় আর সাহায্য আসেও পরাজয়ের আনুপাতিক হারে।<sup>[১১৬]</sup>

হুনায়েনের যুদ্ধের দিন মুসলিমরা তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আত্ম-অহমিকায় ভুগছিল। নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য মোহাবিষ্ট করে ফেলেছিল তাদের। কিন্তু এসব তাদের কোনো উপকারে তো আসেইনি, উলটো তারা হিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে যুদ্ধের প্রথম দিকে। এরপর অল্প কিছু মুসলিম সৈনিক জড়ো হন নবিজি ﷺ-এর পাশে। আল্লাহ তাদের জনবল ও সম্পদে যে তিক্ততা ঢেলে দিয়েছিলেন, সেটার স্বাদ তারা হাড়ে হাড়ে টের পেতে থাকেন। বুঝতে পারেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই মুমিনদের সাহায্যকারী নয়। শেষমেশ আল্লাহ তাআলা এই অল্প সংখ্যক লোকের মাধ্যমেই বিজয় দান করেন।

পক্ষান্তরে বদরের ঘটনা পুরো বিপরীত। তখন মুসলিমরা ছিল অল্প। যুদ্ধের সরঞ্জাম

[১১৪] সূরা আ-লি ইমরান, ৩ : ১২৩।

[১১৫] সূরা তাওবা, ৯ : ২৫।

[১১৬] যাদুল মাআদ, ৩/১৯৮; উহুদ যুদ্ধের সাময়িক বিপর্যয়ের হিকমাহ সম্পর্কিত আলোচনায়।



বলতে তেমন কিছুই নেই। মুহাজিরগণ তো সীমাহীন অত্যাচার-নিপীড়ন সয়ে দেশছাড়া। আনসার সমাজও নতুন এই পরিস্থিতিতে টালমাটাল। এতটা দুর্বল অবস্থায় অহমিকা, গর্ব আর শ্রেষ্ঠত্বের চিন্তা করা তাদের পক্ষে সম্ভবই ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এই হীন-দুর্বল অবস্থায়-ই তাদের সাহায্য করলেন, বিজয় দান করলেন।

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

‘আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে অপদস্থ। অতএব আল্লাহকে ভয় করো, যাতে কৃতজ্ঞ হতে পারো।’<sup>[১১৭]</sup>

পুরো বিষয়টি সাজিয়ে বললে:

মুসলিমরা ব্যর্থ-অপদস্থ হয়ে আল্লাহর কাছে নত হবে। এরপর যখন আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন, বিজয় দান করবেন, তখন বিজয়ের খুশিতে আত্মহারা হয়ে অহমিকা আর আত্মতুষ্টিতে ডুবে যাবে না তারা। বরং নিজেদের দুর্বলতা আর অযোগ্যতার কথা স্মরণ করবে। বুঝবে যে, বিজয়ের কৃতিত্ব আল্লাহরই প্রাপ্য। এটি তার অনুগ্রহ। অবনত মস্তকে শুকরিয়া আদায় করবে রবের কারীমের কদমে। নিজেদের পূর্বের বিপর্যয় আর লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করে সদয় হবে বিজিত জাতির ওপর। তাদের ওপর যুলুম-অত্যাচার করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে।

এই হচ্ছে মুসলিমদের ওপর দীর্ঘায়িত বিপর্যয়ের ব্যাপারে আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ রব্বুল আলামীনের হিকমাহ।

এজন্যই ভাই আমার,

‘মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয়, আড়ালে তার সূর্য হাসে।’

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর লাঞ্ছনা-গঞ্জনার আঁধার কাটিয়ে বিজয়ের সূর্যকে ত্বরান্বিত করুন। আমীন।



## কত বেশি লাইক

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ

‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের উদাসীন রাখে।’<sup>[১১৮]</sup>

কথাটির মর্মার্থ কতটা গভীর! বিশেষত বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে এর বাস্তবতা কতটা ভয়াবহ! আমরা প্রতিযোগিতায় নেমে গেছি, কার লাইক সংখ্যা কত। কার পোস্টে কত শেয়ার। কার ফলোয়ার কত! এমনকি অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে,

‘হুম! আজকে কিছু একটা লিখতে হবে, যা-ই হোক লিখতে হবে। অমূকের পোস্টে এত হাজার লাইক পড়েছে, এত হাজার শেয়ার হয়েছে...’

‘...তাকেও লিখতে হবে। পাছে তার ফলোয়ার আবার কমে না যায়! অমূকের ফলোয়ার তার চেয়ে বেশি না হয়ে যায়!’

‘আমাকে একটা ছবি আপলোড দিতে হবে। এখন সেখানে মুসলিমদের জন্য কোনো ইলমি, ফিকরি, আখলাকি চিন্তা থাক বা না থাক। উলটো সেখানে মানুষের চারিত্রিক দ্বিনি মূল্যবোধ নষ্ট করার মতো কিছু থাকুক, তাতে কী? ছবি একটা ছাড়তে হবে, ব্যাস! এতে তো অনেক লাইক পড়বে, প্রচুর শেয়ার হবে!’

এভাবেই আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা আমাদের হীন থেকে হীন অনর্থক কার্যকলাপের দিকে নিয়ে যায়।

[১১৮] সূরা তাকাহুর, ১০২ : ১।

أَلْهَاكُمْ الْكَأُثْرُ

‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের উদাসীন রাখে।’<sup>[১১৯]</sup>

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

‘এমনি করে (একসময়) তোমরা কবরের সাথে সাক্ষাত করবে।’<sup>[১২০]</sup>

অর্থাৎ, মৃত্যুমুখে পতিত হবে। মাত্র একটা মুহূর্ত; একটা মুহূর্তই আপনাকে আলাদা করে দেবে এতসব অনর্থক প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা আর কবরের মাঝে। আমলের খাতাপত্তর সব গুছিয়ে নেয়া হবে, অথচ সেখানে থাকবে না কোনো আমল। ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে, খেলার মাঠে টানটান উত্তেজনা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে, আর আপনি ফাঁকা বৃত্তে অনর্থক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ মৃত্যুর ভয়াল থাবা আপনাকে টেনে নিয়ে গেল। শুইয়ে দিলো মওতের খাটিয়ায়। অর্জন: একেবারে শূন্য!

পুরোপুরি নিশ্চিত থাকুন, যেসব পোস্টের রিচ বাড়ানোর জন্য আপনি সদা সচেষ্ট থাকতেন, যেগুলোতে লাইকের পর লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার হতো, সেগুলো না আপনার সাথে যাবে, না কোনো উপকারে আসবে।

এই হাজার হাজার, মিলিয়ন মিলিয়ন লাইক, অসংখ্য ভিউও আপনার সাথে যাবে না। কোনো উপকারে আসবে না।

সেই মুহূর্ত; কবরের সেই কঠিন মুহূর্ত। হয়তো সেই সময়টা আপনার অতি নিকটে। তখন ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে ‘أَلْهَاكُمْ الْكَأُثْرُ’-এর মানে কী! তখন নিজের ওইসকল কাজের ব্যাপারে লজ্জিত হবেন, যেগুলো একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য করা হয়নি। তখন এই ভেবে অবাক হবেন যে, আপনি নিজের অন্তরের পরিশুদ্ধতা, ইখলাস আর নফসের মুহাসাবার চেয়েও বেশি লক্ষ রেখেছেন লাইক আর শেয়ারের পরিসংখ্যানের দিকে।

এমন কোনো আমল যেটা হয়তো অত গুরুত্ব দিয়ে করেননি, সেটি কোনো লাইক-শেয়ার পায়নি, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সে সম্পর্কে জানতেন; ওই আমলটিই আপনার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার বিষয় হবে। ওসব অনর্থক লাইক-শেয়ারের আবর্জনার স্তুপের মধ্যে ওই একটি আমলই হবে একবিন্দু আলো।

[১১৯] সূরা তাকাহুর, ১০২ : ১।

[১২০] সূরা তাকাহুর, ১০২ : ২।

## হিফয বনাম ইলম

মুখস্থবিদ্যাকে সর্বত্রই খুব তাচ্ছিল্য করা হয় ইদানীং। অথচ আসল তাচ্ছিল্যের বিষয় হলো না-বুঝে-মুখস্থ করা। তাই প্রিয় মানুষদের অনেকেই খুব চিন্তিত হয়ে প্রশ্ন করে থাকেন,

‘কুরআন হিফয করব, নাকি ইলম শিখব?’

এর জবাব হলো, ইলম মানে কুরআন; কুরআনই ইলম। আর আল্লাহ তাআলা কুরআনকে এভাবেই নামকরণ করেছেন। নবিজি ﷺ-কে বলছেন,

وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

‘আপনার ওপর যে ইলম (কুরআন) এসেছে, তারপরও যদি তাদের (কাফিরদের) প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, তবে নিজের জন্য কোনো বন্ধু ও সাহায্যকারী পাবেন না।’<sup>[১২১]</sup>

এ ছাড়াও আরও আয়াত রয়েছে। অতএব, নবিজি ﷺ-এর কাছে যেই ইলম এসেছে, তার নামই ‘আল-কুরআন’। এজন্য কুরআন ও ইলমকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর কোনো মানে হয় না। মূলত কুরআন হচ্ছে সকল ইলমের চাবিকাঠি। আর ইলমের বাকি শাখাগুলো কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যায়:

‘কুরআন হিফয করার পাশাপাশি অন্যান্য সকল বিষয় থেকে নূন্যতম প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করাই তো আদর্শ নিয়ম। যাতে করে প্রজ্ঞার সাথে দাওয়াহর কাজ করা যায়। কিন্তু পড়াশুনা ও পেশাগত পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং জীবনের সীমাহীন কর্মব্যস্ততার মধ্যে সময় তো খুবই সংকীর্ণ। এখন সেটাকে কি আমরা কুরআন হিফযে কাজে লাগাব নাকি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ-সহ অন্যান্য শারয়ী ইলমে ব্যয় করব?’



এই অবস্থায় প্রিয় ভাই ও বোনদের কাছে আমার পরামর্শ হলো, পড়াশুনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখুন। কুরআনকে প্রথমে মোটামুটিভাবে মুখস্থ করুন। এমনভাবে যে, কোথায় কোন আয়াত আছে, সেটা যেন আপনার মাথায় থাকে। হয়তো একেবারে প্রত্যেকটা আয়াতের নম্বর-পৃষ্ঠা মনে থাকবে না, তবুও সমস্যা নেই। এরপর যে বিষয়টিকে প্রাধান্য দেবেন, তা হলো,

১. নিয়মিত অনুবাদ অধ্যয়ন, কুরআনের আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর, চিন্তা-ফিকির করবেন। অস্পষ্ট জায়গাগুলোতে তাফসীর দেখে নেবেন।
২. ইসতিদালের যোগ্যতা বৃদ্ধি করবেন। কোনো জায়গায় প্রশ্নের সম্মুখীন হলে, সংশয় তৈরি হলে বা মতভেদ হলে যেন আপনার মতের পক্ষে কুরআন থেকে উপযুক্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করতে পারেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বরং এটাই হচ্ছে কুরআন শেখার অন্যতম উদ্দেশ্য।
৩. কিছু সূরা খুব ভালোভাবে হিফয করবেন, যাতে সালাতের মধ্যে কিরাআতে একটা বৈচিত্র্য আসে। সালাতে খুশু-খুযুও বৃদ্ধি পাবে এর মাধ্যমে। যখন নীরবে-নিভৃতে থাকেন, অন্তরাত্মা যখন আল্লাহর কালামের সুধা পান করতে অস্থির হয়ে পড়ে, তখনো এই সূরাগুলো পাঠ করতে পারেন। এ ছাড়াও যেই সময়গুলো বেশির ভাগই এটাসেটা হাবিজাবি চিন্তা করে অনর্থক নষ্ট হয়, বিভিন্ন কুমন্ত্রণা ঘূরপাক খায়, সেসময়ও একমনে তিলাওয়াত করতে পারেন এই সূরাগুলো।

অনেক ভাই যেখানে শুধু হিফযের জন্য লম্বা সময় ব্যয় করে ফেলেন, সেখানে আমি উপর্যুক্ত পদ্ধতিকেই বেশি উপযুক্ত মনে করি।

আমাদের দৈনন্দিন আমল-ওয়াযীফার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অংশ যেন অবশ্যই অবশ্যই কুরআনের জন্য বরাদ্দ থাকে। এটা আমাদের অন্তরাত্মাকে সজীব করবে, ঠিক যেভাবে পানি চারাগাছকে সজীব করে।

এখন কেউ হয়তো বলতে পারে, ‘এতকিছুর সময় কোথায়?’

জবাবে বলব, একটু ভাবুন তো, বিক্ষিপ্ত চিন্তা-ভাবনায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদিতে এলোমেলোভাবে কত সময় নষ্ট হয়! এগুলোর ফলাফল কী? এগুলো থেকে তো হৃদয়ের অপূর্ণতা আর পিপাসা নিয়েই বের হন। এরপর আবার এসব নিয়ে অভিযোগ-অনুযোগ আর আত্ম-নিন্দায় আরও সময় নষ্ট করেন।

একটু চিন্তা করুন, দেখবেন সময় পেয়ে যাবেন।

আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

# সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

| ক্রমিক | বই                                               | লেখক                                       | ধরণ                          |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| ০১     | আমার প্রথম পাঠাগার                               | সন্দীপন টিম                                | শিশুতোষ সিরিজ                |
| ০২     | হেসে খেলে বাংলা শিখি ১                           | মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম                      | বাংলা শেখার প্রাথমিক বই      |
| ০৩     | হেসে খেলে বাংলা শিখি ২                           | মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম                      | বাংলা শেখার প্রাথমিক বই      |
| ০৪     | হেসে খেলে বাংলা শিখি ৩                           | মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম                      | বাংলা শেখার প্রাথমিক বই      |
| ০৫     | ছোটদের ৫০ হাদীস (১ম খন্ড)                        | ডা. নিশাত তামমিম                           | ছোটদের হাদীস শিক্ষা          |
| ০৬     | ছোটদের ৫০ হাদীস (২য় খন্ড)                       | ডা. নিশাত তামমিম                           | ছোটদের হাদীস শিক্ষা          |
| ০৭     | ছোটদের খুলাফায়ে রাশিদা (১-৮)                    | জাকারিয়া মাসুদ                            | শিশুতোষ সিরিজ                |
| ০৮     | ছোটদের দুআ ও হাদীস প্যাকেজ (২০ টি ফ্ল্যাশ কার্ড) | সন্দীপন টিম                                | শিশুতোষ সিরিজ                |
| ০৯     | ছোটদের ঈমান সিরিজ (১-৬)                          | জাকারিয়া মাসুদ                            | শিশুতোষ সিরিজ                |
| ১০     | ছোটদের তাফসিরুল কুরআন সিরিজ (১-৫)                | সন্দীপন টিম                                | শিশুতোষ সিরিজ                |
| ১১     | কুরআনুল কারীম (আরবি)                             | -                                          | -                            |
| ১২     | হারিয়ে যাওয়া মুক্তো                            | শিহাব আহমেদ তুহিন                          | অনুপ্রেরণামূলক               |
| ১৩     | বিপদ যখন নিয়ামাত                                | মুসা জিবরীল, আলি হাম্বুদা, শাওয়ানা এ আযীয | অনুপ্রেরণামূলক               |
| ১৪     | বিপদ যখন নিয়ামাত ২                              | ড. ইয়াদ কুনাইবী                           | অনুপ্রেরণামূলক               |
| ১৫     | মানসাক্ষ (কষ্টিপাথর ২)                           | ডা. শামসুল আরেফীন                          | ধর্ম প্রতিরোধে পরিবার ও সমাজ |
| ১৬     | কাঠগড়া (কষ্টিপাথর ৩)                            | ডা. শামসুল আরেফীন                          | সুন্নাহ ও বিজ্ঞান            |
| ১৭     | মনের মতো সালাত                                   | ড. খালিদ আবু শাদী<br>ডা. শামসুল আরেফীন     | আত্ম-উন্নয়নমূলক             |
| ১৮     | অলসতা : জীবনের শত্রু                             | ড. খালিদ আবু শাদী                          | অনুপ্রেরণামূলক               |
| ১৯     | সূরা কাহফের আলোকে মুক্তির মশাল                   | ড. খালিদ আবু শাদী                          | আত্ম-উন্নয়নমূলক             |



|    |                                |                                             |                                           |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ১৭ | অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়            | ডা. রাফান আহমেদ                             | ইসলামের সৌন্দর্য ও নাস্তিক্যবাদের অসাড়তা |
| ২১ | হোমো স্যাপিয়েন্স              | ডা. রাফান আহমেদ                             | বিবর্তনবাদ ও বস্তুবাদের অসাড়তা           |
| ২২ | বিশ্বাসের যৌক্তিকতা            | ডা. রাফান আহমেদ                             | আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা     |
| ২৩ | দরজা এখনো খোলা                 | ইমাম ইবনু আবিদ দুইয়া                       | অনুপ্রেরণামূলক                            |
| ২৪ | আত্মার ওষুধ                    | ইমাম ইবনুল কাইয়িম <small>رحمہ اللہ</small> | আত্ম-উন্নয়নমূলক                          |
| ২৫ | শেষের অশ্রু                    | দাউদ ইবনু সুলাইমান আল উবাইদি                | তাওবার গল্প                               |
| ২৬ | মেঘপাখি                        | আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব                      | গল্পগ্রন্থ                                |
| ২৭ | প্রশান্ত অন্তর                 | মহিউদ্দীন রূপম                              | আত্ম-উন্নয়নমূলক                          |
| ২৮ | বাতায়ন                        | মুসলিম মিডিয়া টিম                          | সামাজিক সমস্যা ও সমাধান                   |
| ২৯ | অন্ধকার থেকে আলোতে ১           | মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার              | নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব       |
| ৩০ | অন্ধকার থেকে আলোতে ২           | মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার              | নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব       |
| ৩১ | অন্ধকার থেকে আলোতে ৩           | মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার              | নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারিদের জবাব       |
| ৩২ | উলটো নির্ণয়                   | মোহাম্মাদ তোয়াহা আকবর                      | আত্ম-উন্নয়নমূলক<br>অনুপ্রেরণামূলক        |
| ৩৩ | জীবনের সহজ পাঠ                 | বেহনুমা বিনত আনিস                           | জীবনঘনিষ্ঠ গল্প                           |
| ৩৪ | তারা বলমল                      | আরিফুল ইসলাম                                | সাহাবীদের জীবনী                           |
| ৩৫ | কুরআন : জীবনের গাইডলাইন        | ড. ইয়াদ কুনাইবী                            | আত্ম-উন্নয়নমূলক                          |
| ৩৬ | কুরআন বোঝার মজা                | আবদুল্লাহ আল মাসউদ                          | আত্ম-উন্নয়নমূলক                          |
| ৩৭ | অসংগতি                         | আবদুল্লাহ আল মাসউদ                          | সামাজিক অসংগতি                            |
| ৩৮ | কুরআনের সৌন্দর্য               | আবদুল্লাহ আল মাসউদ                          | আত্ম-উন্নয়নমূলক                          |
| ৩৯ | ভ্রান্তিবিলাস                  | জাকারিয়া মাসুদ                             | নারীবাদের অসাড়তা ও ইসলামে নারীর মর্যাদা  |
| ৪০ | হিজাব আমার পরিচয়              | জাকারিয়া মাসুদ                             | অনুপ্রেরণামূলক                            |
| ৪১ | আল্লাহর সন্তুষ্টির সন্ধানে     | ড. নাজীহ ইবরাহীম                            | আত্ম-উন্নয়নমূলক                          |
| ৪২ | মুসলিমের পরাজিত মানসিকতা       | ড. আবদুল্লাহ আল খাতির                       | আত্ম-উন্নয়নমূলক                          |
| ৪৩ | শয়তানের ফাঁদ                  | ড. আবদুল্লাহ আল খাতির                       | আত্ম-উন্নয়নমূলক                          |
| ৪৪ | আল্লাহর বন্ধু ও শয়তানের বন্ধু | ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহ                       | আত্ম-উন্নয়নমূলক                          |
| ৪৫ | উম্মাহর কিংবদন্তিরা            | মুহাম্মাদ আম্মারুল হক                       | সংক্ষিপ্ত জীবনী                           |



ড. ইয়াদ কুনাইবী একজন দাঈ এবং অ্যাকটিভিস্ট। মানুষকে ইসলামের ব্যাপারে সচেতন করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন প্রায় দুই যুগ ধরে। নিজ কমিউনিটির পাশাপাশি অনলাইন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তিনি সমান সক্রিয়। তার বিভিন্ন প্রবন্ধ, লেকচার ছড়িয়ে আছে ফেইসবুক, টুইটার, ইউটিউব এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে।

তাঁর লেখনী ও বক্তব্যের বিষয়বস্তু বিস্তৃত। তিনি জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। আবার ইসলামের আলোকে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণও সমান গুরুত্ব পায় তাঁর আলোচনায়। তাঁর আলোচনাগুলোতে তিনি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন কুরআন ও সুন্নাহর অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও জীবনে প্রয়োগের ওপর।

‘কুরআন: জীবনের গাইডলাইন’ বইটি তাদাঈর সম্পর্কিত তাঁর সাড়া জাগানো সিরিজ ‘বিল কুরআনি নাহইয়া’ এর সরল অনুবাদ। কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক গভীর করতে বইটি সহযোগী ভূমিকা পালন করবে ইন শা আল্লাহ।